Historical Analysis

Of Syrian Revolution

Writer: Bearded Bengali

হিস্টোরিক্যাল অ্যানালাইসিস

সিরিয়ান রেভুলেশন

বিয়ারডেড বেঙ্গলী

প্রকাশকালঃ ৫ রজব.১৪৪৬ হিজরী
৭ জানুয়ারি ২০২৫

লেখকঃ বিয়ারডেড বেঙ্গলী
প্রচ্ছদঃ নাসিম আহমাদ
সম্পাদনাঃ নাসিম আহমাদ
প্রকাশনায়ঃ লাস্ট ইরা অ্যানালাইসিস

বইটি পাবেন,
https://archive.org/details/@lea_archive
অথবা,
https://t.me/lastera_analysis

সূচিপত্র

অধ্যায়ঃ ১

"মধ্যপ্রাচ্যে,আল-কায়দা এবং আশ-শাম"

অধ্যায়ঃ ২

"ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এন্ড সিরিয়া"

কুখ্যাত সিদনায়া কারাগার | দামাস্কাস, সিরিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হাদিসে বর্ণিত বৃহত্তর বরকতময় বিলাদ আশ-শাম[1] নিয়ে "HISTORICAL ANALYSIS OF SYRIAN REVOLUTION" বইটি। শামে (সিরিয়া) চলমান সংকট, শত্রু-মিত্র, জিহাদি দলের উত্থান-পতন, যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ, ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুকে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে অনেক উপকারী হবে বলে আশা করছি। সেই সাথে উপমহাদেশের অনেক ঘটনাপ্রবাহ অনুধাবন করতেও পারবেন ইনশাআল্লাহ।

পাশের ছবিটিতে খুলাফায়ে রাশিদিন, উমাইয়া এবং আব্বাসি খিলাফতের শাম প্রদেশের সীমারেখা। যা বর্তমানে ভেঙে ভেঙে জাতীয়তাবাদের মধ্যে দিয়ে খন্ড খন্ড হয়ে সিরিয়া,তুর্কি,ফালিস্তিন, লেবানন, জর্ডান....নামে আলাদা আলাদা দেশ হয়েছে।

[1] বিলাদ আশ-শাম - https://tinyurl.com/3pzjf8xa

অধ্যায়ঃ ১

“মধ্যপ্রাচ্যে,আল-কায়দা এবং আশ-শাম”

ইরান-শিয়া এবং রাশিয়া প্রোপাগান্ডার মেশিন

ঠিক যেভাবে শিয়া-রাশিয়া প্রোপাগান্ডা মেশিন সিরিয়ার মুজাহিদদে আইসিস (ISIS) বলে বেড়াচ্ছে, ঠিক সেভাবেই এদেশে গণতান্ত্রিক গং আমাদের অনেককে আইসিস বলে বেড়ায়। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই আইসিসের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দাড়িয়েছিল এই (শামের) মুজাহিদ দলগুলোই। এমন কি এদেশেও আইসিসের বিরুদ্ধে সবার আগে যারা কলম ধরেছিল, তাদেরকেই উল্টা আইসিস ট্যাগ দেয়া হয়। কিন্তু কেন?

কেনো তারা শুধু আল-কায়দা (AQ) এমনকি এখন আর তালিবানান ট্যাগও দেয় না। বরং আইসিস ট্যাগ জুড়ে দেয়? কারণ সহজেই যেন ক্যান্সেল আউট করা যায়, তাদের হয়রানি করা যায়, টেকনিক্যালি তাদের জানমাল হালাল করে দেওয়া যায় সরকারী বাহিনীগুলোকে উসকানি দিয়ে। এবং নিজেদের শঠতা, আইডিওলজিকাল (মতাদর্শগত) দুর্নীতিগুলো জাস্টিফাই (ন্যায়সঙ্গত) করা যায়।

শিয়া-রাশিয়া কি জানে না, সেখানে আইসিস নেই? অবশ্যই জানে। আইসিস প্রায় বিলুপ্ত এবং তাদের কোমর ভেঙে গেছে। আইসিস পিছন থেকে ছুরি না মারলে হয়তো আরো ১০ বছর আগেই আমরা দামস্কাসে (সিরিয়া/শামের রাজধানী) বাশারের প্রাসাদ ভেঙে ফেলতে পারতো। কিন্তু ১০ বছর আগের কথা, তখন আইসিস নিজেদের ক্ষমতার জন্য, বাশারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে অন্যান্য সুন্নী দলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে।

আইসিসের দাবী বাকিরা শরীয়াহ কায়েমের জন্য যুদ্ধ করে না, মুক্ত এলাকায় শরীয়াহ কায়েম করে না, এবং তারা পশ্চিমা সমর্থন প্রাপ্ত। লাস্ট পয়েন্টে শিয়াদের সাথে আইসিস একমত। অথচ কথাগুলো আংশিক সত্য। কিছু দল সত্যই শরীয়াহ কায়েমের জন্য যুদ্ধ করতো না।

ঠিক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তা করুন, বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সকলেই শরীয়াহপন্থী না। আবার মুক্ত এলাকায় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সচ্ছ বিচার নিশ্চিত না করে হুদুদ[2] কায়েম করা সম্ভব নয় যোদ্ধাদের জন্য। অথচ আইসিস অ্যাটাকে নাম দিয়েছে তারা শরীয়াহ কায়েম করছে না। উল্টো তারা যেনতেন ভাবে মুক্ত অঞ্চলে নিজেদের মনমত কোর্ট স্থাপন করে বিচার করে হুদুদ কায়েম করার চেষ্টা করেছে, যেটার সচ্ছতা নিয়ে বাকিদের সাথে, জনগণের তাদের ঝামেলা তৈরী হয়েছে।

এগুলো ছাপিয়ে মূল কথা ছিল, আইসিস জোর করে সবার নেতৃত্ব নিতে চাইছিলো, অথচ সকলে তাদের নেতৃত্ব মানতে রাজি ছিল না। এমনকি এক পর্যায়ে আইসিস নিজেদের আমীরকে খলিফা বলে ঘোষণা করে যেন সব সুন্নী দলের উপর বাধ্যবাধকতা আসে খলিফার আনুগত্যের জন্য।

তারা বাকি সুন্নী দলগুলোর সাথে পলিটিক্যাল এবং ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন না রেখে জোর করে যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের নিজেদের অনুগত হবার জন্য বাধ্য করার পথ বেছে নিলো। লাভ কি হলো? উভয়পক্ষ যুদ্ধ করেনিজেদের দুর্বল করলো। এবং এই ফাঁকে শিয়ারা এবং বাশার আল-আসাদ একটু হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

আল-কায়দা শুরুতে এই যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করলেও, আইসিস তাদের যুদ্ধের জাস্টিফিকেশন হিসেবে বাকিদের বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি বের করে তাকফির করা শুরু করলো। এমনে কোন একদলের মধ্যে কুফর পাওয়া গেলে সেটা বাকি সবার জন্য জেনারালাইসড করা শুরু করলো।

---

[2] হুদুদ - ইসলামী এমন শাস্তিকে বোঝায় যেগুলো ইসলামী আইনের (শরীয়াহ) অধীনে আল্লাহ কর্তৃক বাধ্যতামূলক এবং নির্ধারিত - https://tinyurl.com/45nmjb7v

তখন থেকে মুজাহিদ এবং উলামারা তাদের খাওয়ারিজ বলা শুরু করলো। একটা পর্যায়ে তারা যখন সুন্নী গ্রুপগুলো ধরাশায়ী করে প্রবল প্রতাপের সাথে তেল ক্ষেত্রগুলো জয় করছিল, ঠিক তখন আমেরিকা আর তার মিত্রদের নিয়ে তাদের উপর অ্যাটাক শুরু করলো। সাথে রাশিয়াও।

এত দিন আমেরিকা চুপচাপ সুন্নী গ্রুপগুলোর সাথে আইসিসের যুদ্ধ দেখছিল। সময়টা ২০১৩ থকে ২০১৫। যখন তারা কুর্দি এলাকাগুলোতে ঢুকলো, যেগুলো তেল ক্ষেত্রে ভরপুর ছিল তখন পর্যন্ত তুর্কিও আইসিসের পক্ষে ছিল।

এমনকি শোনা যায় যে আইসিস ব্ল্যাকমার্কেটে তুর্কির কাছেই তেল বিক্রি করতো। কিন্তু আমেরিকা এবং তাদের মিত্রদের আক্রমণের চোটে, আইসিস বাধ্য হয় তার দখলকৃত এলাকাগুলো ছেড়ে দিতে যা তারা সুন্নী দলগুলোর থেকে দখল করেছে, যেগুলো আবার শিয়া-আসাদ বাহিনী থেকে মুক্ত করেছিল সুন্নী দলগুলো। এখন সেগুলো আমেরিকা-রাশিয়া সমর্থিত মার্কসবাদী কুর্দি বাহিনীর দখলে। এবং তেল ক্ষেত্রগুলো টেকনিক্যালি আমেরিকা-রাশিয়া মিলে মিশে খায়।

শিয়াদের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার মূল কারণ সিরিয়ান ইস্যু

এক ভাই মজা করে বলেছিলেন যে, বেরলভীরা হচ্ছে শিয়াদের সুন্নী শাখা। এক জায়গায় দেখলাম যে, বেরলভীদের একটা গ্রুপ সিরিয়ার মুজাহিদদের তাকফিরী, খারিজী বলে প্রচার করতেছে। তাদের প্রমাণ হলো শিয়াদের বানানো এডিটেড ভিডিও আর প্রোপাগান্ডা নিউজ।

মুজাহিদরা নাকি ইজরায়েলের দালাল, সিআইএ ট্রেইন্ড। আর ইরান-রাশিয়া হচ্ছে খাঁটি মুসলিম, কোন ধরণের জুলুম তারা করতেই পারে না। হবেই না কেন? তথাকথিত সুফী রমজান কাদীরভ তো পুতিনের খাস চামচা, যে এখন চেচনিয়ার শাসক। অর্থাৎ আক্বীদা -মানহাজগত কারণেই রাজনৈতিকভাবে তারা শিয়া ব্লকে থাকবে। অনেকে বলে তারা সিরিয়ার বিষয়ে কনফিউসড, কে হক্ব তারা বুঝতে পারতেসে না। আমি উত্তরটা জানি!

উত্তর হলো, আপনার কুরআন পড়া নেই, সীরাহ পড়া নেই, সাহাবাদের বিশেষ করে খলিফাদের জীবনীগুলো জানা নেই। শুনুন কুরআন আপানাকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে শিখাবে। সাথে সাথে গুনাহ মুক্ত জীবন। যেটা আসলে আমার নিজের ক্ষেত্রেও খুব কমতি আছে। যা ভুল হয়, হচ্ছে - সেটা একারণেই মূলত।

তারপর আসবে শামের বিষয়ের হাদিস এবং মর্যাদা জানা নিয়ে। এরপর আসবে বিভিন্ন দলের আক্বীদা, চিন্তাধারা, মানহাজ এগুলো জানা নেই। এজন্য আপনারা আসলে কোন খবর কতটুকু সত্য,কতটুকু মিথ্যা, কে কেনটা কোন উদ্দেশ্যে করতে পারে সেটা বুঝতে পারছেন না।

আপনাকে জিও-পলিটিক্স এবং ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সও বুঝতে হবে। নতুবা শিয়াদের খপ্পড়ে পড়বেন। শুরুটা হবে তাদের রাজনৈতিক বিভ্রান্তিতে পড়ে। এরপর তাদের অপরাধ জাস্টিফিকেশন, এরপর সাহাবাদের বিষয়ে বিষোদগার। এরপর এই সাহাবাদের দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন সংরক্ষণ করেছেন, সেই কুরআন নিয়েই সন্দেহ শুরু হবে। আর আমাদের তারা তাদের মত কাফির বানিয়েই ছাড়বে।

এরদোগান, তুর্কি যদি ইরানের বিরুদ্ধে না যেত, আমার ধারণা, জামাতের বেশীর ভাগ লোক শিয়াদের সমর্থন করতো। কিন্তু মুসলিম ব্রাদারহুড[3] ৫০ বছর আগ থেকেই এই আসাদ পরিবারের সাথে লড়াই করছে, এ কারণে জামাতের লোকজন পুরোপুরি ইরানের সমর্থন করতে পারছে না। তবুও অনেক বিভ্রান্তকে দেখা যায় আজকে ইরান তো কালকে তুর্কি আবার দুইটা মিলিয়ে কিসব গোঁজামিল যে দেয়!

জোট সরকারের আমলে এদেশে ইরানের ব্যাপক প্রমোশন হয়েছিল। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে জামাত সমর্থকরও ইরান প্রীতিতে মজে ছিল। কিন্তু সিরিয়ার ঘটনা আবার ২০১১ এরপর শুরু হলে অনেকের মোহ ভাঙ্গে।

আবার ২০১৯ পর সেই মোহ ফিরে আসে। অনেকে আবার শিয়া প্রীতিতে ফিরে যায়। অথচ এই দেশে শিয়াদের বিষয়ে আমাদের প্রজন্মের স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার মূল কারণই ছিল সিরিয়ান ইস্যু।

ফালিস্তিন দিয়ে শিয়ারা নিজেদের তাকিয়া প্রোজেক্ট বাস্তবায়ন শুরু করলে আল্লাহ তা'আলা সিরিয়া দিয়ে সেটা নস্যাৎ করছেন। তবে যারা হতভাগা, তারা আসলে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেও সত্যকে গ্রহণ করবে না।

---

[3] মুসলিম ব্রাদারহুড (ইখওয়ানুল মুসলিমীন)- https://tinyurl.com/b6tevt92

সিরিয়ান জিহাদে আল-কায়দা এবং তুর্কির নীতি

সিরিয়ান জিহাদের আল-কায়দা এবং তুর্কির নীতিটা বলার চেষ্টা করি। সিরিয়া এবং তুর্কির বর্ডার হচ্ছে কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চল। কুর্দি[4] জাতীয়তাবাদীরা আবার আমেরিকা-রাশিয়া সমর্থিত। তুর্কির জন্য তারা বড় থ্রেট, কারণ এরা স্বাধীন রাষ্ট্র চায়। তো এই ক্ষেত্রে তুর্কি আমেরিকা-রাশিয়ার সাথে সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে প্রক্সি ব্যাবহারের চেষ্টা করে।

শুরুতে আইসিস কুর্দি জাতিয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ে তুর্কিকে সুবিধা দিচ্ছিল। পরবর্তীতে, সুন্নী বিপ্লবীদের তুর্কিপন্থী অংশটা বাশার আল-আসাদকে ফেলে কুর্দিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তুর্কির প্রক্সি হিসেবে।

এই অঞ্চলটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক তেল ক্ষেত্র আছে। তুর্কি চেষ্টা করে এসবের মাধ্যমে আমেরিকা-রাশিয়ার বোঝাপড়ার টেবিলে নিজেদের স্বার্থটা উদ্ধার করতে। সিরিয়ার মানুষের স্বার্থ তার জন্য সেকেন্ডারি ইস্যু। এই যে আলেপ্পো বা হালব জয় হলো, এটা বিপ্লবীদের'ই থাকতো, যদি তুর্কি তখন এন্টি এয়ার ক্রাফট মিসাইল দিত।

কিন্তু তারা দেয়নি। তারা ততটুকু সমর্থন করে না, যতটুকু করলে বিপ্লবীরা জিতে যায়। আবার একেবারে সরিয়েও নেয় না, যতটুকু নিলে বিপ্লবীরা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। এখন দেখেন সামনে কি হয়!

কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে দেখেন, ইরান তাদের জান-প্রাণ দিয়ে দিচ্ছে গত ১২ বছর ধরে বাশার আল-আসাদকে টিকানোর জন্য। তাদের অর্থনীতি বাজি লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ফালিস্তিনের ক্ষেত্রে তারা প্রক্সি লড়ে, অথচ সিরিয়াতে তাদের সেনারা এসে লড়াই করে। এমনেই পাক-আফগান থেকেও শিয়াদের নিয়ে এসেছে সিরিয়াতে লড়াই করার জন্য।

---

[4] কুর্দি অঞ্চল ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কজুড়ে বিস্তৃত ভূমি। কুর্দি সম্পর্কে আরো জানুন, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kurds

যদি শিয়ারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা আলেপ্পো জয় করছো, গাযযা কেনো পারছো না? তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তোমারা তো দামাস্কাসে বসে আছো, আল-কুদসে যেতে কেনো পারছো না, গোলান হাইট তো তোমাদের বর্ডারেই - তোমাদের যুক্তি তো তোমাদের জন্য বেশী প্রযোজ্য। শিয়ারা কেবল মুর্খ লোকজনকেই প্রতারিত করতে পারবে, আর তারা নিজেরাও মূর্খ!

আল-কায়দার নীতিটা হলো যে, আল-কায়দা এ যুদ্ধ শুরু করেনি। আল-কায়দা এভাবে গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে না। আল-কায়দা এমনকি শিয়া-রাশিয়ার বিরুদ্ধে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধের পক্ষে না, যদি না তারা আগে আগ্রাসন চালায়। তখন অবশ্যই রিটালিয়েট করতে হবে। সিরিয়াতে সেটাই হয়েছে আল-কায়দা আগ্রাসী শিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে।

এখানে আল-কায়দার সাথে তুর্কির মতপার্থক্য হচ্ছে পাকিস্তানের সাথে আল-কায়দার মত পার্থক্যের মত। আফগানের আল-কায়দা অলমোস্ট রেডিমেইড তালিবানদের পেয়েছিল। কিন্তু সিরিয়াতে তালিবানানদের মত একক চেইন অব কমান্ডের কোন স্থানীয় দল নেই। তো শুরুতে আল-কায়দার প্ল্যান ছিল, নীরবে তালিবানদের মত একটা ফ্রন্ট তৈরী করা - যেটার স্থানীয় সমর্থন থাকবে। পরবর্তীতে যারা একটা ইমারাত তৈরী করবে।

পাকিস্তান এবং তুর্কি উভয় চেষ্টা করে যে, তাদের প্রক্সি ব্যবহার করে কোনো স্বার্থ হাসিল করা - যেটা আবার আল-কায়দার স্বার্থ বিরোধী। যদিও তালিবানানদের ক্ষেত্রে পাকিস্তান আল-কায়দার কাছে হেরে গিয়েছে। তালিবানানরা পাকিস্তানের কথা না শুনে মূলত আল-কায়দার কথাই শুনেছে - কারণ তালিবানানরা আসলে রেডি ছিল শোনার জন্য।

কিন্তু সিরিয়ার বিপ্লবীরা আল-কায়দার কথা ঠিক মত শুনেনি। এদিকে তুর্কিও বিপ্লবীদের এমনভাবে দেখে রাখতো যেন তারা আল-কায়দার কথা না শুনে এবং সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়।

একবার তো তুর্কি রাশিয়ার সাথে কি একটা চুক্তি প্রায় করেই ফেলছিল যেটা সিরিয়ার সুন্নীদের স্বার্থ বিরোধী।

তখন প্রেস কনফারেন্সে রাশিয়ার দূতকে মেরে ফেলা হয়।[5] সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, ইসলামে দূত হত্যা নিষিদ্ধ। কিন্তু সেটা না করলে তো রাশিয়া-তুর্কির সম্পর্ক নষ্ট করা যেত না। হয়ত চুক্তিটা হয়েই যেত।

সবাই দোষারোপ করলো আল-কায়দা এসব করে আসলে কি মজা পায়? ইসলাম বিরোধী কাজ! অথচ ওই দূত তো আল-কায়দার কাছে রাশিয়ার দূত ছিল না! এটা জাস্ট একটা উদাহরণ যে, তুর্কি-আল-কায়দা উভয়ই তাদের সফট পাওয়ার ইউস করেছে নিজেদের প্রভাব টিকিয়ে রাখার জন্য বিপ্লবীদের উপর।

কিন্তু তুর্কি তাদের স্টেট পাওয়ারের কারণে আল-কায়দাকে দামিয়ে রাখতে পেরেছে এবং বিপ্লবীদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে। যেমনটা পাকিস্তান তালিবানানদেরকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আল-কায়দাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। হয়তো আফগানের সমীকরণটা অনেক সরল ছিল, যেটা সিরিয়ার ক্ষেত্রে খুবই কম্প্লিকেটেড (জটিল)।

সিরিয়া এমন একটা জায়গা যেখানে আমেরিকা-রাশিয়া, শিয়া-সুন্নী, গ্লোবাল-লোকাল, ইজরায়েল ইস্যু, ডেমোক্রেসি-শরীয়াহ সব কনফ্লিক্ট একইসাথে আছে।

আল-কায়দা যখন নিভৃতে সিরিয়াতে তালিবানদের মত ফ্রন্ট গঠনে ব্যস্ত ছিল, ঠিক তখন ইরাক থেকে বাগদাদী এসে সেটাকে ওপেন একটা

---

[5] Russian Ambassador to Turkey Shot Dead in Ankara- https://www.youtube.com/watch?v=A5QjQiBQxNE&rco=1

প্রোজেক্ট হিসেবে ঘোষণা দিল যে সব বিপ্লবীকে তার অনুগত হতে হবে। যেটা পুরোপুরি বাস্তবতা এবং রাজনীতি বিবর্জিত ছিল।

মানুষজন অটো একটা চেইন অব কমান্ডে এসে পড়তো যদি হৃদয়গুলো এক করা যেত। এক চেইন না থাকলেও, জোট করলে সেটাতে আস্থা থাকতো। কারণ তুর্কি ছাড়াও তখন কাতার, সৌদী, আমিরাত এগুলো সমর্থক হিসেবে ছিল।

আরব আমিরাত সাইড চেইঞ্জ করে এখন আসাদের পক্ষে। সৌদী চুপ। আর কাতার সম্ভবত তুর্কির পক্ষে আছে। কিন্তু শুরুতে আইসিস এবং পরবর্তীতে তুর্কির কারণে আল-কায়দা সিরিয়াতে নিজেদের প্ল্যানগুলো বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

একদিকে আইসিস খুঁজে খুঁজে আল-কায়দার টপ লিডারদের মারছিল, যাদের আমেরিকাও অনেক চেষ্টা করে মারতে পারেনি। আরেকদিকে আমেরিকা তুর্কির এয়ার বেইস থেকে উড়ে এসে আল-কায়দার লীডারদের খুঁজে খুঁজে মেরে একেবারে লীডার শূণ্য করে দিচ্ছিল।

বিপ্লবীদের অনেকে বললো যে, আমেরিকার এয়ারস্ট্রাইক থেকে বাঁচতে হলেও অন্তত আল-কায়দার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে।

কিন্তু ওইদিকে আবার রাশিয়ার এয়ারস্ট্রাইকও আছে। এসব নিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে আল-কায়দাপন্থী এবং আল-কায়দাবিরোধীদের বিতর্ক আজো চলমান।

হামাস-তালিবানদের সাথে সিরিয়ান বিপ্লবীদের সম্পর্ক কি?

হামাস-তালিবানান উভয় দলই সিরিয়ার বিপ্লবীদের পক্ষে এবং শিয়া-রাশিয়া জোটের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। কারণ গত ৫০ বছরেরও আগে থেকে মুসলিম ব্রাদারহুড সিরিয়ার তাগুত[6] আসাদ পরিবারের সাথে লড়াই করে আসছে। সুতরাং ব্রাদারহুড ইকোসিস্টেমের অংশ হিসেবে সকল ব্রাদারহুড পন্থী দল অবশ্যই বিপ্লবীদের পক্ষে থাকবে, কারণ তারা তাদেরই সন্তান।

আগের ইতিহাস জানার জন্য বাজারে জাস্ট 5 মিনিটস (Just 5 Minutes) নামক একটা বই পাওয়া যায়, যেখানে এক মুজাহিদের বোনকে ৫ মিনিটের কথা বলে ৯ বছর আটকে রাখা হয়। তিনি সেসবের বর্ণনা দেয়। সাথে হামা গণহত্যাসহ সিরিয়াতে নুসাইরী শিয়াদের হাতে সুন্নীদের নির্যাতনে ঘটনাগুলো পড়লে আপনার মনে হবে যে, হাসিনার আমলে আপনারা তুলনা মূলক আরামেই ছিলেন। যদিও ওরকম যুদ্ধ পরিস্থিতিতে চলে গেলে, হাসিনা আরো ব্রুটালিটি (বর্বরতা) দেখাতে পিছ পা হতো না।

সাথে সাথে আল-কায়দা ইকো সিস্টেমের অংশ হিসেবে তালিবানদের দুইটা ফ্রন্টও স্বাভাবিকভাবে বিপ্লবীদের পক্ষেই থাকবে, কারণ ব্রাদারহুডের পরে, আল-কায়দারও অনেক অনেক কুরবানি আছে গত দশকের যুদ্ধে। আপনারা যদি আল-কুদসের ম্যাপটা দেখেন, দেখবেন যে তিনটা রাষ্ট্র খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো মিশর, তারপর জর্ডান এবং সিরিয়া - সাথে লেবাননও। আর মিশর ব্যতীত বাকিগুলো সব বরকতময় আশ-শামের অংশ। নবীদের পূণ্যভূমি, শত মুজাহিদ, সাহাবাদের ভূমি, ইমামদের ভূমি এবং হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতার ভূমি, কত যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যে চারণ ভূমি এই আশ-শাম।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যখন জেরুজালেম মুক্ত করেন। তখন আগে মিশর তারপর সিরিয়া, জর্ডান এই অংশগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেন। তারপর সেখান থেকে জেরুজালেম মুক্ত করেন।

---

[6] নেদায়ে তাওহীদ বইটি পড়ুন। তাগুতসহ আরো অনেক অজানা জানতে পারবেন।

আমাদের ক্ষেত্রেও সেইম কথা, এই অঞ্চলগুলোতে শক্তিশালী ইসলামী ইমারত গঠন করে, ইমামের অধীনে আল-কুদসকে মুক্ত করতে হবে। তাওহীদের পতাকা ব্যতীত আর কোন পতাকা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ডিসার্ভ করে না। কথাটা ভালো মত মনে রাখেন লিখে রাখেন।

যেই কথা বলে আমরা শাহাদাত চাই, যা বলে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাত ওয়াজিব, সেই জিনিসটাই কেবল বাইতুল মুকাদ্দাস ডিসার্ভ করে। আল-কুদস হলো পবিত্র।

হামাস এবং তালিবানদের পক্ষ থেকে পূর্বে অনেক ট্রেইনার (জিহাদের প্রশিক্ষক) পাঠানো হয়েছিল সিরিয়ার বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। এমনকি আমেরিকার মতে খোরাসান গ্রুপ নামে একটা ইউনিটও ছিল। তাছাড়া বিপ্লবীদের পক্ষে হামাস নেতাদের অনেক বক্তব্যে পাবেন।

যেগুলোর পর ইরানের সাথে তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়। ইরান হামাসকে সাপোর্ট দেয়াও অফ করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে ইজরায়েলের আগ্রাসনের কারণে আবারো মিত্রতা স্থাপনে বাধ্য হতে হয় উভয় পক্ষকেই।

আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে গাযযাতে এরকম অনেক মুজাহিদ ছিল যারা পূর্বে সিরিয়ান বিপ্লবীদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীতে যুদ্ধ কিছুটা থেমে গেলে তারা আপন ভূমিতে ফিরে আসে।

অর্থাৎ হামাস, তালিবান এমনকি আল-কায়দাও একদিকে শিয়াদের নেতা ইরানের সাথে ডিপ্লোমেটিক (কূটনীতিক) সম্পর্ল রাখলেও, অন্য কোন ফ্রন্টে জোট বাঁধলেও, সিরিয়ার ইস্যুতে একমত যে,

ইরান সুন্নীদের উপর চরম নৃশংস গণহত্যাকারী আসাদ পরিবারকে সাহায্য করেছে এবং রাশিয়ার আগ্রাসনে সাহায্য করেছে। এগুলো না করলে ইজরায়েল সুবিধা পাবে, সুযোগ পাবে এই যুক্তিতে তাদের অনাচার সহ্য করা হবে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে একসাথে লড়তে হবে, নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও।

আমরা না আমেরিকার দালাল, না রাশিয়ার। সাউদী আর তার চামচারা হতে পারে আমেরিকার দালাল, ঠিক সেভাবে ইরান এবং তার চামচারা রাশিয়ার দালাল।

তুর্কি-কাতার চেষ্টা করে কিছুটা দালালী, কিছুটা নিজেদের স্বার্থ, কিছুটা মুজাহিদদেরও স্পেস। আর আরব আমিরাতও কূটনীতি করা শুরু করেছে আমেরিকা-রাশিয়া এবং চীন বলয়ের মাঝে।

কিন্তু এরা হচ্ছে সবচাইতে নিকৃষ্ট সুন্নী বলয়ের মধ্যে। কারণ এদের কোন কিছুই মুজাহিদদের পক্ষে যায় না। সৌদীও নতুন আরব আমিরাত হবার ধান্ধায় আছে। এর কারণ হলো, আমেরিকা আগের থেকে দুর্বল। আগে এরা খাস চামচামী করতো, বলার আগেই দালালী করতো।

এখন বললেও, বলে দেখি পরে জানাচ্ছি বলে হিসাব নিকাশ করে আর কি। কিন্তু শয়তানি এখনো যায় নি। কারণ এখনো তারাইজরায়েলের বিরুদ্ধে কিছু করতে রাজি না।

তাছাড়া আমেরিকা তথা পশ্চিমারা এতদিনে তাদের আক্বীদা এবং সামাজিক মূল্যবোধ আরো বেশী নষ্ট করে ফেলেছে। সেটার সমীকরণ তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি।

বাশার আল-আসাদের গোত্র নুসাইরী-শিয়ারা আসলে কারা?

আপনারা জানেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি খিলাফত কিংবা অটোমান এ্যাম্পায়ারকে পরাজিত করার পর, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ইতালি আর রাশিয়া মিলে সাইকস-পিকট চুক্তির[7] মাধ্যমে সালতানাতের বিভিন্ন অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

---

[7] সাইকস-পিকট চুক্তি (Sykes-Picot Agreement)- https://tinyurl.com/5yjs5288

তখন বর্তমান সিরিয়া এবং লেবাননটা ফ্রান্স পায়। ব্রিটিশরা পায় ফালিস্তিন, জর্ডান, ইরাক এই অংশটা। রাশিয়া পায় চেচনিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, আজারবাইজান ওই অংশটা।

ইতালি পায় তুর্কির তথা আনাতোলিয়ার দক্ষিণ অংশটা। অনেকগুলো অংশ অবশ্য তুর্কি পুনঃউদ্ধার করে আধুনি তুর্কি রাষ্ট্র গঠন করলেও, আশ-শাম, ইরাক এগুলো উপনিবেশী শক্তি হাতেই রয়ে যায়।

তো সিরিয়াতে ফ্রান্সের দরকার ছিল স্থানীয় দালাল শক্তি, যারা তাদের হয়ে কাজ করবে শাসন করবে। নুসাইরী[8] শিয়ারা হচ্ছে সেই গোষ্ঠি যারা ফ্রান্সের দালালিতে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু কেনো?

নুসাইরী হলো শিয়াদের একটা এক্সট্রিম শাখা যারা আলী (রা.) কে আল্লাহর সিফাত[9] দিয়ে দেয়। এরা নিজেদেরকে আলাউই-ও বলে। কিন্তু আগে থেকেই ছিল ডাকাত, বর্বর শ্রেণীর লোকজন। এরা ছিল খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, যাযাবর টাইপের।

তো এদের দিয়ে ফ্রেঞ্চরা (ফ্রান্স) স্থানীয় সেনাবাহিনী গঠন করে। এবং স্বাধীনতার পরও সিরিয়ান সেনাবাহিনীতে তাদের ব্যাপক আধিপত্য ছিল।

এবং বাশার আল-আসাদের বাপ হাফিজ আল-আসাদ এই নুসাইরীদের সাপোর্টে, এবং বাথ পার্টির[10] সাপোর্টে ক্ষমতায় এসে সিরিয়াকে সোস্যালিস্ট সেক্যুলার রিপাবলিক ঘোষণা করে (সমাজতান্ত্রিক ধর্মহীন প্রজাতন্ত্র)। মাঝে দিয়ে সিরিয়া আর মিশর কিন্তু ফেডারেশন স্টেট গঠন করেছিল ইজরায়েলকে শান্ত করতে আরব জাতীয়তাবাদী বাথ পার্টির আদর্শে।

---

[8] নুসাইরিয়া একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়- https://tinyurl.com/3s5p9b5h

[9] https://www.alkawsar.com/bn/article/3410/
https://www.alkawsar.com/bn/article/3479/
https://tinyurl.com/yc7t38s6

[10] বাথ পার্টি- https://tinyurl.com/3xs6b83k

কিন্তু তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। মিশরের জামাল আবদেল নাসের, গাদ্দাফি, সাদ্দাম, ইয়াসির আরাফাত, ভুট্টো এরা সকলে ছিল বাথ পার্টি কিংবা এটার দ্বারা প্রভাবিত লোকজন। তারা সোস্যালিস্ট সেক্যুলার এবং আরব ন্যাশেনালিস্ট আইডিয়া রাখতো। এবং মুসলিম ব্রাদারহুড লোকালি এই সেক্যুলার সোস্যালিস্ট বাথ পার্টির সাথেই আইডিওলজিকাল স্ট্রাগলের (ভাবাদর্শগত/মতাদর্শগত সংগ্রামের) মুখোমুখি হয়েছিল।

বাহিরের বিশ্বে কিন্তু তারাইজরায়েল বিরোধী মুসলিম বিশ্বের কান্ডারী। কিছুটা ইসলামী ভাইব, কিছুটা আরব জাতীয়তাবাদ এগুলো মিশলে এক একজন হিরো। অথচ এরা নিজ দেশে ইসলামিস্টদের উপর গণহত্যা চালায় আর ইজরায়েলের বিরুদ্ধে একটু আধটু যুদ্ধ করে মাঠ ছেড়ে পালায়। তখন বাংলাদেশেও সোস্যালিস্ট মেন্টালিটি অ্যাটাক ফেনোমেনমন (Phenomenon/ঘটমান বিষয়) হয়ে দাড়িয়েছিল - এমনকি ইসলামিস্ট, সোস্যালিস্টও এখনকার ডেমোক্রেটিক ইসলামিস্টের মত।

তখন ব্রাদারহুডের সাথে সৌদীর ভালো সম্পর্ক, কিন্তু বাথ পার্টির সাথে বিরোধ। একটা সময় ইরানের উত্থান হলো। বাথ পার্টিও জৌলুশ হারিয়ে বার্থ হতে লাগলো। এই পার্টির স্বৈরশাসকরা

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, এমনকি একে অপরেরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো, যেমন ৯০ এর দশকের গালফ ওয়ারে[11] সিরিয়ার হাফিজ আল-আসাদ, আমেরিকার সাথে মিলে সাদ্দামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। অথচ উভয়ই বাথ পার্টির।

ইরানের উত্থানের পর তারা বাথিসম বাদ দিয়ে আবারও পুরোনো শিয়াইসমের মাধ্যমে ইরানের সাথে সম্পর্ক তৈরী হলো। এটা হলো আশির দশকের কথা। তখন হিজবুল্লাহ তৈরী করা হলো পিওর শিয়া মিলিশিয়া হিসেবে। আরেকদিকে তৎকালীন মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর নির্যাতন তো ছিলই।

---

[11] গালফ ওয়ারে (Gulf War)- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gulf_War

যেটা এক পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। এমনকি ব্রাদারহুড নেতারা এদের হাত থেকে রেহাই পেতে খোমেনীর কাছে সাহায্য চাইলেও খোমেনী সাহায্যের নামে উল্টো তাদের ধরিয়ে দেয়, ফাঁসিয়ে দেয় - এমনও কথিত আছে।

তখন একটা চুক্তির মত হয়েছিল যে, একটা অংশ ইসলামিস্টদের জন্য ছেড়ে দিবে, সম্ভবত হামা। যেখানে ইসলামিস্টরা শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন করবে। এতে ইসলামিস্টরা খুশি হয়ে সবাই সেখানে জড়ো হয়। সব যখন গুছাতে ব্যাস্ত তখন হঠাৎ একদিন আসাদ বাহিনী চারদিকে থেকে আক্রমন করে গণহত্যা চালায়।এরপর তো ইসলামপন্থীদের কোমর ভেঙে পড়ে। মুজাহিদদের অনেকে আফগানিস্তানে চলে আসে। গ্লোবাল জিহাদের আর্কিটেকচার খ্যাত আবু মুসাব আস-সুরী[12] এখান থেকেই উঠে আসেন।

তারপর আফগানিস্তানে রাশিয়ার পরাজয়ের পর তো ওইসব রাশিয়াপন্থী স্বৈরশাসকরা আমেরিকার দালালী শুরু করে। তখন আল-কায়দা গঠিত হতে থাকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন গ্রুপের মুজাহিদ নেতাদের নিয়ে। তারা সবাই একটা বিষয়ে একমত হয় যে, এইসব স্বৈরশাসক, সেক্যুলার শাসক তারা মূলত ওয়েস্টের (পশ্চিমা) পুতুল।

আমরা যতবারই যতভাবেই তাদের পরাজিত করি না কেন, পরবর্তিতে ওয়েস্ট কোন না কোনভাবে তাদের একটা পুতুলকে বসাবেই। এই যে পুতুল বসানোর সক্ষমতা এটা যদি আমরা বন্ধ করতে না পারি, হাসিনার পর ইউনুস আসবে, ইউনুসের পর ভারত না হোক, এমন কাউকে আসতে হবে যে আমেরিকা সমর্থিত হবে।

---

[12] পরিচয়- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Setmariam_Nasar
নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত, আলোচনা.....- https://gazwah.net/?cat=451

যে আমেরিকান এ্যাসেটগুলোকে প্রোটেক্ট (আমেরিকার পা চাটাদের রক্ষা) করবে, তাদের এক্সপ্লয়েটশন (শোষণ), ইনজেকশনের (অবৈধ অনুশাসন) বাঁধা দিবে না।

আর যদি আমেরিকার সেই সক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন স্থানীয়ভাবে যদি ইসলামিস্টরা ক্ষমতা পায় সেটা টেকসই হবে। এবং এটা আরব বিশ্বের খুব দরকার, নতুবা ইজরায়েলকে সাইজ করার মত লঞ্চপ্যাড পাওয়া যাবে না। পাপেটরা সেক্যুলার হোক কিংবা শুধু ন্যাশনালিস্ট (জাতীয়তাবাদী) তারা তাদের দুনিয়াবী ইন্টারেস্টের কারণে খুব সল্প মূল্যে আপোষ করে ফেলবে, এতদিন করে আসছে।

আপোষহীন ইসলামিস্ট স্টাবলিসমেন্ট (সংস্থা/প্রতিষ্ঠান) সিরিয়া, মিশর কিংবা জর্ডানে থাকলে ইজরায়েলের জন্য টিকে থাকা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এমনকি তুর্কি, সাউদী, লিবিয়া, তিউনিসিয়া ইয়েমেনও। কারণ জলসীমা (সমুদ্র পথে) অবরোধ করার জন্য খুব গুরত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে ইয়েমেন।

হাফিজ আল-আসাদের পর, তার ছেলে বাশার আল-আসাদ ক্ষমতায় আসে। ১০ বছর শাসনও করে তথাকথিত আধুনিক রাষ্ট্র সিরিয়া টেকনিক্যালি ইরাকে আমেরিকান আগ্রাসনে ইরানের মত আমেরিকার পক্ষেই ছিল। কারণ আমেরিকা শিয়াদের বিরুদ্ধে চুপ ছিল, রাশিয়াও এজন্য চুপ ছিল। শুধু ইজরায়েলের চাপে এবং পারমাণবিক বোমা তৈরীর বিরুদ্ধে আমেরিকা ইরানকে চাপ দিচ্ছিল।

এরপর গত দশকে আরব বসন্তের ধাক্কায়, সিরিয়াতেও সরকার পতনের আন্দোলন শুরু হয় যে, এক স্বৈরশাসকের অধীনে আর কতদিন? বেশীরভাগ সম্পদ সংখ্যালঘু নুসাইরী শিয়া গোষ্ঠিদের হাতে।

প্রশাসন, আর্মিতে সব শিয়া আধিপত্য। এরপর আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আসাদ মিলিটারী এ্যাকশনে গেলে আর্মির সুন্নী অংশটা বের হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কখনো বিদ্রোহীরা কিছু শহর দখল করে নেয়। আবার তাদের থেকে ইরান-রাশিয়ার সহায়তায় আসাদ সেগুলোর পুনঃদখল করে। বিদ্রোহীরা পিছিয়ে আছে, কারণ তাদের এয়ার সাপোর্ট নেই।

যদিও তাদের সাপোর্টে আমেরিকা, তুর্কি, সৌদী, কাতার, আরব আমিরাত ছিল। কিন্তু আমেরিকা আসাদের সাথে সমঝোতায় যাওয়ার পর আরব আমিরাত এখন বাশারের পক্ষে। সৌদী নিরপেক্ষ এবং তুর্কি-কাতার বিরুদ্ধে থেকেও কিছুটা ডিপ্লোমেসী (কূটনীতি) করে প্রক্সি হিসেবে ব্যবহার করেছে বিদ্রোহীদের।

এর মাঝে আইসিসের (ISIS) বাড়াবাড়ির কারণে বিদ্রোহীরা দামস্কাসের কাছে গিয়েও আবার পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। এরপর আল-কায়দা গ্লোবাল ইকোসিস্টেমে থাকা না থাকা নিয়ে বিদ্রোহীদের মতপার্থক্য হওয়ায়, আল-কায়দা সেখানে নেতৃত্বের পজিশনে যেতে না পারলেও তাদের ইনফ্লুয়েন্স কিছুটা হলেও বজায় রেখেছে, যেমন বিদ্রোহীরা শরীয়াহ শাসনের জন্যই যুদ্ধ করছে।

আমেরিকা সমর্থিত কিছু সেক্যুলার গোষ্ঠি আছে, আবার তুর্কি সমর্থিত কিছুটা গণতন্ত্রপন্থী গোষ্ঠিও আছে। কিন্তু মোটাদাগে বিদ্রোহীদের তুর্কি সমর্থন দিচ্ছে কারণ তুর্কি ছেড়ে দিলে, আল-কায়দা আবারো শক্তিশালী পজিশনে চলে যাবে।

সিরিয়াতে আসলে কে কি চায়?

ইজরাইল আর আমেরিকা চায় বাশার এবং বিপ্লবীদের মধ্যেই কেউ না জিতুক। যেমন বিপ্লবীরা যদি ইরান-রাশিয়কে একটু সাইজ দেয় they won't mind that. কিন্তু তারা চায় বাশার আল-আসাদ দুর্বল হয়ে টিকে থাকুক। যখন দেখবেন যে, বিপ্লবীরা বাশারের শেষ করার ধারপ্রান্তে, তখন দেখবেন ইজরাইল আমেরিকা তার সাহায্যে নেমে পড়েছে।

অলরেডি আমেরিকা সমর্থিত মার্কিনিস্ট কুর্দিদের দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুভ করছে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে পূর্বে আসাদ বাহিনী মার্কিনীদের সাথে এ্যালাই করেছে। সাদ্দামকে পতনে সাহায্য করেছে সেখানকার বাকি শিয়া এবং ইরানের মত।

আবার বাশার টিকে থাকলে ইজরায়েলের বর্ডরাও সেইফ। ইরান এবং এর প্রক্সিগুলো ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সুন্নী মুজাহিদদের মত থ্রেট না। বরং তাদেরকে কিছু করলে তারা রিএ্যাক্ট করে। নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু করে না, যেমনটা হামাস করেছে।

আমেরিকা চায় মুসলিম গ্রুপ গুলো এরকম হয়ে যায় যেন পুরো পলিটিক্সের উপর ডিপেন্ড হয় হার্ড পাওয়ার ছেড়ে দেয়। আর সফট পাওয়ারে বারবার তাদের আউট স্মার্ট করা যায়। কিন্তু তালিবানদের হার্ডপাওয়ার থাকায়, আমেরিকা ডিপ্লোম্যাটিক টেবিলেও হেরেছে।

তেমনি হামাসকে গত ২০-৩০ বছর হার্ড পাওয়ার ঠিক মত ব্যবহার করতে দেয়া হচ্ছিল না। তারাও একটা সময় গণতান্ত্রিক লোকজনদের পাল্লায় পড়ে পুরো সফট পাওয়ারের দিকে ঝুকছিলো হয়ত পশ্চিমাদের সফট পাওয়ার দিয়ে রাজি খুশি করিয়ে, কিছু অর্জন সম্ভব।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে বুঝতে ছিল যে এসব সব ধোঁকা। পুরা আরব বিশ্ব ইজরায়েলের সাথে আপোষ করে ফেলছে।

তাদের নিশ্চিহ্ন করার প্ল্যান চলছে। এবং তারা ভিতর ভিতর অনেক দিন ধরে প্ল্যান করে - ৭ অক্টোবরে হার্ড পাওয়ার ইউস করলো। বাকি সবার পরিকল্পনা গেলে ভেস্তে।

হার্ড পাওয়ার এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তো কুরআনে হাদিদের কথা বলেছেনই। মাঠের শক্তি আপনাকে বার্গেনিং (দর কষাকষি) টেবিলে এগিয়ে রাখবে। আপনাকে সবাই চেক দিলো, আপনি কাউরে চেক দিতে পারলেন না - তাহলে হবে না। গণতান্ত্রপন্থী দলগুলা পশ্চিমাদের খুশি করতে এই ভুলটা করে থাকে।

এমনকি শুধু দাওয়াহপন্থী দলগুলাও। ক্যাপাবলিটি সাধ্যমত অর্জন করা আর স্ট্রাইকে যাওয়া একই বিষয় না। পরেরটা নর্মাল না হোক, আগেরটা আপনার লাগবেই। নতুবা আপনার আসলে তেমন দাম থাকবে না রাজনীতির মাঠে। আপনি কিছু আদায়ই করতে পারবেন না, সেই অর্থে!

তুর্কিও এদিকে সিরিয়াতে দুর্বল শাসন চায়। তারা মুজাহিদদের ততটুকু হেল্প করে না, যতটুকু করলে তারা বাশারকে পরাজিত করে ফেলতে পারে। আবার পুরো সমর্থনও সরিয়ে নেয় না যেন, বাশার বাহিনী মুজাহিদদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে। বরং তার মাঠের পরিস্থিতি দেখে সেগুলো নিয়ে নিজেদের স্বার্থ আদায়ে সচেষ্ট থাকে।

আরব আমিরাত তো পুরাই এখন বাশারের পক্ষে। জর্ডান চুপ আবার বাশারের পক্ষে মানে আমেরিকা যা বলবে। সাউদী তো পুরাই চুপ। আর কাতার কিছুটা তুর্কির পদ্ধতিতে চলছে। তারা সকলেই আছে শুধু তাদের স্বার্থটা নিয়ে। কিন্তু ইরান আবার এদিকে বাশারকে বাঁচাতে নিজেদের জান-মাল সব দিয়ে দিচ্ছে।

রাশিয়াকে হিসাব করে চলতে হচ্ছে। যদিও বাশারকেই সাপোর্ট দিচ্ছে, কিন্তু ইউক্রেনের কারণে এদিকে এ্যাগ্রেসিভ হতে পারছে না। হিজবুল্লাহও ইজরাইলের সাথে যুদ্ধ ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছে। ইরাকে থাকা শিয়া-মিলিশিয়ারও অনলাইনে এই করতে সেই করতেসে ভিডিও ছড়ালেও তারা আসলে বাস্তবে সেই অর্থে মুভ করতেসে না।

ইরাক-সিরিয়ার মাঝের বিশাল মরুভূমি। মাঝে মাঝে কিছু জনপদ, তেলক্ষেত্র। এগুলো আমেরিকার দখলে। কিছু জায়গায় শিয়া-মিলিশিয়ারাও আছে। আছে কুর্দি মার্ক্সিস্ট বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ। কিছু জায়গায় অল্পসল্প দাঈশও আছে হয়ত।

ইউফ্রেটিস তথা ফুরাত নদী চলে গেছে মাঝ দিয়ে। নদীর দুই ধারে শুধু জনপদ। রাক্কা এই নদীর পাড়েরই একটা বড় শহর। এখন এসডিএফ নামক আমেরিকা-রাশিয়া সমর্থিত কুর্দি মার্ক্সবাদীদের দখলে।

এই শহর নিয়ন্ত্রণের জন্য আইসিস, আল-কায়দা গত দশকের ভয়ংকর তম যুদ্ধ করেছিল। আইসিসের খারেজীরা আল-কায়দা সহ অন্যান্য মুজাহিদদের পরাজিত করে, তাদের গলা কেটে কেটে শহরের রাস্তা জুড়ে সারি বানিয়েছিল। তাদের লাশ বিকৃত করে অবজ্ঞা আর হাসি ঠাট্রা করেছিল। উভয় পক্ষ আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। কিন্তু একপক্ষ নিজেদের মত নিয়ে অহংকার করলো। আরেক পক্ষের ভুল ত্রুটির জন্য ছাড় দিলো না।

তাদের উপর সীমলঙ্ঘন করেই ক্ষ্যান্ত হলো না, তাদের উপর ইরতিদাদের অভিযোগ তুললো। আল্লাহ তা'আলা এই জালিমদের ঘাড় ভেঙে দিয়েছেন। হঠাৎ ক্ষমতা আর অহংকার তাদের ধ্বংস করলো। আমাদেরও তাওবা-ইস্তিগফার করা উচিত নিয়মিত, আমরাও যেন এভাবে ধ্বংস না হই। ভিন্ন মতের মুসলিম ভাইদের ছোট-খাটো ভুল ক্ষমা করতে হবে। এমনকি ব্যক্তিগত রেশারেশিও, যদি না সেটা উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর হয়।

এই রাক্কা শহরের কাছেই সেই বিখ্যাত সিফফিনের প্রান্তর। যেখানে আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) এর দল মুখোমুখি হয়েছিলে ১৪০০ বছর পূর্বে। এখনেই আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) শহীদ হবার পর, মুয়াবিয়া (রা.) এর দল বুঝাতে পারে, তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা যুদ্ধ ছেড়ে দেয়, সন্ধির আহবান করে।

আমরা কি তাদের মত ভুল বুঝাবুঝিগুলো সুধরাতে পারছি? ইনশা'ল্লাহ পারবো। আলাদা থাকি কিন্তু একের অন্যের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করবো না, এই ওয়াদাটুকু করি। রোমান সম্রাট মুয়াবিয়া (রা.) কে চিঠি লিখেছিল যে, তারা আলী (রা.) বিরুদ্ধে মুয়াবিয়া (রা.) কে সাহায্য করবে।

তখন মুয়াবিয়া (রা.) প্রতিউত্তোরে লিখেছিলেন, রোমের কুকুর! এদিকে এক পা বাড়ালে আলীর পক্ষে প্রথম শহীদ হবো আমি মুয়াবিয়া!

আজ আমরা সেই শহর আমেরিকা-রাশিয়ার হাতে তুলে দিয়ে বসে আছি। কয়েক বছর পূর্বে সেই শহরে আমেরিকা-রাশিয়া উভয়ের সেনারাও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। খবরটা শুনে আমি বলি, আল্লাহ! এ কেমন শহর! এখানে আল-কায়দা-আইএস ফাইট করে। আবার কিছু বছর পরে এই শহরে আমেরিকা-রাশিয়াও ফাইট করে। আরো আরো আগেই এই শহরে রোমান আর পারসিয়ানরা ফাইট করত কিন্তু এই শহর তো আলী আর মুয়াবিয়ার শহর! তাদের যুদ্ধের শহর এবং তাদের সন্ধির শহরও! রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

সিরিয়ার মুজাহিদরা সিরিয়ার স্বাধীনতা চায় - একটি শক্তিশালী ইসলামী ইমারাত চায়, যা হবে আল-কুদস মুক্ত করার পথ। হামাসও তা চায়! আল-কায়দাও তা চায়! তালিবানরা তো চায়ই! আমরাও তাই চাই। আল্লাহুম্মা আমীন।

সিরিয়ায় থাকা বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী

SDF = Syrian Democratic Force (PKK-YPG-Marxist Kurd) – US/Russia

PKK-YPG তুর্কিতে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে লিস্টেড। এজন্য আমেরিকা তাদের সিরিয়ার ডেমোক্রিটিক ফোর্স হিসেবে চালাচ্ছে। ওইদিকে তুর্কি সহ বাকি সবার কাছে HTS সহ বাকি মুজাহিদরা সন্ত্রাসী হিসেবে লিস্টেড।

কিন্তু তারাই মূল ফাইটার। তুর্কি ডিরেক্ট তাদের সাথে দহরম-মহরম করতে পারে না। কারণ তারা শরীয়াহ কায়েমের কথা বলে। তাই তুর্কি সিরিয়ান ন্যাশেনাল আর্মি নামে নিজেদের একটা বাহিনী বানিয়েছে। SNA = Syrian National Army - Turky

SAA = Syrian Arab Army – Iran/Russia

এটা হচ্ছে মূল বাশার বাহিনী। এখন SDF এর কুর্দি মার্ক্সিস্টরা বাশারের পক্ষে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছে।

আর কুর্দি ইসলামিস্ট আল-কায়দা লিংকড আনসার আল-ইসলাম মুজাহিদদের পক্ষে আছে।
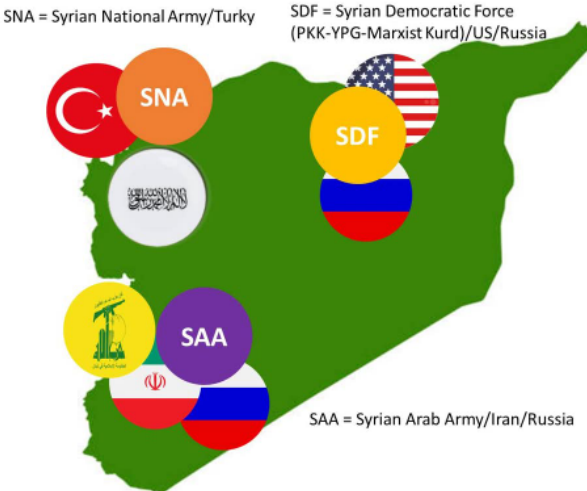
কুর্দি কারা? সব কুর্দি কি খারাপ?

ছবিটা আলান কুর্দির।[13] যুদ্ধের কারণে রিফিউজি হিসেনে তুর্কি থেকে ইউরোপ যাওয়ার সময় এই ঘটনাটা ঘটে।

কুর্দি হলো একটা জাতির নাম। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জাতির নাম কুর্দি। ইমাম ইবনু তাইমিয়ার মায়ের ব্যাপারেও বলা হয়ে থাকে যে তিনি কুর্দি ছিলেন। এই জাতির বসবাস ইরাকের উত্তরে, বর্তমান তুর্কির দক্ষিণ পূর্বে, ইরান এবং সিরিয়ার কিছু অঞ্চল। বাঙলী জাতির কথা চিন্তা করতে পারেন যে অধিকাংশই বংশগত কারণে সুন্নী। কিন্তু এখন অনেক মতবাদের লোকজন আছে।

যেমন কিছু লোক স্বাধীন কুর্দিস্তান চায়। এতে হবে কি তুর্কি, ইরাক, ইরান, সিরিয়া থেকে ভালো একটা অংশ নিয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে। এবং রাষ্ট্রটির খনিজ তেলে ভরপুর। কিন্তু আবার ল্যান্ড লক (স্থলবেষ্টিত)।

---

[13] আলান কুর্দি - https://tinyurl.com/3xwswrdb , https://en.m.wikipedia.org/wiki/Death_of_Alan_Kurdi

এই স্বাধীনতাকমী কুর্দিদের একটা সময় রাশিয়া সমর্থন করতো, এজন্য এরা হচ্ছে বাম-মার্কিনিষ্ট। এখন আমেরিকাও সমর্থন করে। তারাই মূলত আমেরিকান দালাল।

কিন্তু তারা আবার তুর্কির শত্রু। তুর্কিতে তারা মাঝে মধ্যে ঝামেলা করে। আবার ইরাকের কুর্দিরা সাদ্দামের আমলেই স্বায়ত্তব শাসন পেয়েছিল। ইরান-সিরিয়াতে তাদের বসবাসের অঞ্চল কম। কিন্তু সিরিয়ার যুদ্ধের সুযোগে আমেরিকা এইসব কুর্দিদের অনেক ক্ষমতায় করেছে। দাঈশকে পরাজিত করার পর, সেই অঞ্চলগুলো তারা এই কুর্দিদের হাতেই দিয়েছে।

সব কুর্দিরাই কি খারাপ? না। ইসলামিস্ট কুর্দিও আছে। যেমন ইরাকের আনসার আল-ইসলাম।

যখন বুশ ইরাকে আক্রমণ করে, আল-কায়দা, আইএস এর সবচাইতে বড় মিত্র ছিল ইরাকে কুর্দিস্তানের আনসার আল-ইসলাম।

তারা এখন সিরিয়াতেও মুজাহিদদের সাথে লড়ছে। সিরিয়াতেও কুর্দিস্তান ইসলামিক ফ্রন্ট নামে একটা সংগঠন ছিল, সেটা পরে অবসান হয়ে যায় অন্য দলের মধ্যে। মোট কথা হলো শাহবাগী-লীগারদের মত কিছু কুর্দি আমেরিকার দালালিতে ব্যস্ত। আবার কিছু কুর্দি জান-মাল আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিচ্ছে।

আমরিকরা SDF সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্স নামে একটা ক্যামোফ্লেজ দল বানিয়েছে যেটা আসলে ওই মার্কিনিষ্ট কুর্দিদের নিয়ে গঠিত। তারা একদিকে তুর্কির শত্রু, দাঈশের শত্রু আবার মুজাহিদদেরও শত্রু। অর্থাৎ তারা খারিজী, মুর্জিয়া, এবং আহলুস সুন্নাহ সকলের শত্রু।

আবার শিয়াদের সাথে মিত্রতার থাকলেও, মাঝে মাঝে ঝামেলা হয়। প্রাণের বন্ধু না আর কি। অথচ এরা হয়ত কোন সুন্নী ঘরেরই সন্তান। তথাকথিত স্বাধীনতা আর স্বাধীন কুর্দিস্তানের লোভ দেখিয়ে তারা

আমেরিকা-রাশিয়ার ভাড়া খাটা সেনা। মরলেও শাহাদাতের আশা নেই। কারণ তারা তো সেক্যুলার।

মেয়েরাও এসে যুদ্ধ করে পরিস্থিত নাকি এত খারাপ তাদের। অথচ তেল ক্ষেত্রগুলো থেকে আমেরিকানরা তেল নিয়ে যাচ্ছে, তারা সেগুলা পাহারা দিচ্ছে।

এদিকে তুর্কি আমেরিকারে ডিরেক্ট কিছু বলতে না পারলেও এদের পিটিয়ে আমেরিকারে শিক্ষা দেয়ার চিন্তা করে। অথচ আমেরিকা যখন দাঈশ পিটাইতে ছিল, তখন তুর্কির চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কিছু করার ছিল না।

জেনে অবাক হবেন যে, দাঈশ শক্তিশালী হবার পর তুর্কি লাভবান হচ্ছিল। কারণ দাঈশ ওই বাম কুর্দিদের সাইজ দিচ্ছিল, এতে তুর্কি বর্ডার সেইফ হচ্ছিল।

আর দাঈশ ব্ল্যাক মার্কেটে তেল কিছুটা কমে ছেড়ে দিচ্ছিল, এতেও তুর্কি অনেক লাভবান হচ্ছিল। অথচ আমেরিকা এসে দাঈশকে হঠিয়ে ওই জায়গাটাতে কুর্দিদের বসালো।

দেখেন আমরা খারিজী, মুর্জিয়া, আহলুস সুন্নাহ আমাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি থাকলেও - আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হই অনেক ক্ষেত্রেই এখানেও শিয়ারা এসে পড়লে ঝামেলা। আর ডিরেক্ট কাফির, মুশরিকার এসে পড়লে তো আমাদের আমও গেলো-ছালাও গেলো।

HTS এর সাথে আল-কায়দার মতবিরোধের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ

হায়াতু তাহরীর আশ-শাম (HTS)-এর সাথে আল-কায়দার মত বিরোধ নিয়ে আমি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করবো।

আল-কায়দার মূল থীম হলো আমেরিকান স্বার্থে আঘাত করে আমেরিকাকে দুর্বল করা। যেন কোনো বিপ্লবের পর আমেরিকা তার পুতুল বসাতে না পারে। এই জন্য জরুরী না যে, লোকালি যেসব বিপ্লব হবে সেগুলো আল-কায়দার মাধ্যমেই হতে হবে। বরং যে কোন ইসলামপন্থী গ্রুপই সেটা করতে পারে - কিন্তু আল-কায়দা চায় যে তাদের উপর আল-কায়দার ইনফ্লুয়েন্স (প্রভাব বিস্তার) থাকুক।

সিরিয়ার বিপ্লবের শুরুতে আল-কায়দা ট্রাই করছিল যে, নুসরাহ সহ আহরার এবং বাকি আরো যেসব দল আছে, সবগুলোতে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে সেগুলোতে নিজেদের ইনফ্লুয়েন্স (প্রভাব বিস্তার) বাড়ানো, যেন বিপ্লবের পর একটা ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠায় আন্তার্জাতিক তাগুতদের সাথে আপোষ করা থেকে বিপ্লবীরা বিরত থাকে।

কিন্তু বাগদাদী এসব না বুঝে নিজের একাট সেন্ট্রাল কমান্ড তৈরী করার চেষ্টা করছিল জোর করে। যেখানে আল-কায়দার কথা হলো কোন দল নিজ থেকে একটা চেইন অব কমান্ডে আসলে ভালো। আল-কায়দার অধীনে আসলেও ওয়েলকাম। কিন্তু না আসতে চাইলেও অন্তত একটা বোঝাপাড়া সম্পর্ক রেখে এগিয়ে চলা।

যেমন আফগান তালিবান, পাকিস্তান তালিবান, ইরাকের কুর্দি আনসার আল-ইসলাম এরকম আরো অনেক দলের সাথে আল-কায়দা মিত্রতার সম্পর্ক রেখে কাজ করে - একটা ইকো-সিস্টেমের মত ক্রিয়েট করেছে।

আল-কায়দার আরেকটা পলিসি হলো যে, সব জায়গায় নিজেদের নাম প্রকাশ না করা। মাসলাহা-মাফসাদা বুঝে কাজ করা। যদিও প্রয়োগের বেলায় বিভিন্ন সময় ব্লান্ডার হয়েছে। যেমন সিরিয়ার ক্ষেত্রে আল-কায়দার শুরুতে ইচ্ছা ছিল না যে আল-কায়দার নাম প্রকাশ পাক।

কিন্তু তখন বাগদাদী হাত থেকে বাঁচতে আল-জুলানী আল-কায়দার সাথে নিজের সম্পর্কের কথা বলে। যেন, আল-কায়দা তার পক্ষে থাকে এবং মুজাহিদরা আল-কায়দার মর্যাদার কথা চিন্তা করে আল-জুলানীর দল ত্যাগ না করে।

এই পরিচন প্রকাশ হবার পর, আমেরিকা এবং তার মিত্ররা আবার আরেকদিকে রাশিয়াও মুজাহিদের উপর নির্বিচারে হামলা করা সুযোগ পায়। এখানে গ্লোবাল এবং লোকাল জিহাদের একটা কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট দেখা দেয় যে, আমেরিকা এবং এর মিত্রদের এস্যাসেট গুলোকে হুমকি না দিলে আমেরিকা হামলা করবে না।

কিন্তু আল-কায়দার সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখলে আমেরিকা আর তার মিত্রতা তাদের সেইফ এক্সিট দিবে না। তো বাশারের পতনের জন্য আমেরিকার সাথে সরাসরি সংঘর্ষ না গিয়ে ওই চ্যাপ্টারে একটা পজ দেয়ার জন্য আল-জুলানি আল-কায়দার ইকোসিস্টেমে তিনি আর নেই বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু আল-কায়দা বিষয়টাতে সন্তুষ্ট না হলোও, যেহেতু তার একটা ভ্যালিড যুক্তি ছিল, তাই প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল থেকে কিছু বলেনি।

এর আগে ইরাকের আল-কায়দা-ও কিছুটা সেইম কাজ করেছিল, গেরিলা যুদ্ধের মাঝখানে নিজেদের স্টেট ঘোষণার মাধ্যমে, যা আল্টিমেটলি আল-কায়দা এবং ইরাকের জিহাদের চরম ক্ষতি করেছিল।

আল-কায়দা চুপ থাকলেও, আল-কায়দা লিংকড লোকাল গ্রুপগুলো আল -জুলানীর উপর বিরক্ত হচ্ছিল, কারণ তুর্কির প্রতি তিনি খুব বেশী

ডিপেন্ডেন্ট (নির্ভরশীল) হয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ তুর্কির মধ্য দিয়ে জনগণের লজিস্টিক (যুদ্ধের গোলা বারুদ,রসদ) সাপোর্ট আসে।

তুর্কি এগুলো বন্ধ করে দিলে জনগণ বিদ্রোহ করবে। ওইদিকে বাশার বাহিনী আবারো স্ট্যাবল (সুস্থিত/স্থায়ী) হয়ে যাচ্ছিল, আল-জুলানী নিজেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিলেন না। এমনকি যারা চালাতে চায়, তাদের এক হাত নিচ্ছিলেন, তাদের বন্দী করছিলেন।

হামাসের ব্যাপারেও সেইম অভিযোগ ছিল যে, তারা নিজেরাও জায়োনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান না চালিয়ে, ইরান সহ বাকিদের ডিপ্লোমেসীর (কূটনীতি)-র উপর ভর করে ছিল।

এবং যারা হামাসের কথা না শুনে নিজেরা নিজেরা আলাদা দল করে, জায়োনিষ্টদের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাচ্ছিল, তাদের দমন করছিল।

যেমন ইবনু তাইমিয়াহ মসজিদের ইনসিডেন্টটা। তো জুলুমের পর, আল-কায়দাও হামাসকে বিব্রত করার চেষ্টা করেনি। আর তাহরীরকেও আল-কায়দা বিব্রত করতে চায় না নিজেদের ব্যানার তুলে, ঠিক যেভাবে তালিবানদেরও সেটা হোক পাক কিংবা আফগানের তাদের বিব্রত করতে চায় না, নিজেদের উপস্থিতি ক্লেইম করে। তারা শুধু চায় শরীয়াহ কায়েম হোক, এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সঠিক উপায়ে অভিযান চালানো হোক।

তাই হামাস কিংবা তাহরীর যেই মুসলিমদের বিজয়ে কাজ করবে, শরীয়াহ কায়েম করবে, আল-কায়দা তাদের পক্ষে। যদিও তাদের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা, সংশোধনের উপদেশ দেক না কেন। কারণ আল-কায়দা আল্টিমেট টার্গেট কিন্তু নিজেরা আমীর কিংবা সুলতান হওয়া নয়, বরং মুসলিম জনগণের পছন্দে, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের পছন্দে আমীর নিয়োগ হবে, ইমারাহ প্রতিষ্ঠা হবে। শরীয়াহ কায়েম হবে।

এরকম একাধিক ইমারাহ প্রতিষ্ঠা হতে থাকলে নিজেরা নিজেরা শূরা করে ফেডারেশন তৈরী করবে। হয়ত একটা সময় তারা যথেষ্ঠ শক্তিশালী হলে একজন খলিফা নিয়োগ দিবে, যার খিলাফতকে সমগ্র উম্মাহ বরণ করেনিবে। এটাই গ্লোবাল জিহাদ!

তো সিরিয়াতে মুজাহিদদের বিজয় মানে আল-কায়দারই বিজয়, কারণ তারা এটা চায়, যেই করবে তাদের স্বাগত জানাতে হবে। এবং যা যা প্রয়োগ হচ্ছে মাঠে, এগুলো আল-কায়দা আরো ২০-২৫ বছর আগে লিখে গিয়েছে।

আপনার আবু মুসআব আস-সুরীর “দাওয়াতুল মুকাওয়ামা” পড়ুন, এবং জেনারেল আল-আদিলের লেখাগুলো পড়ুন। দেখবেন যে তালিবানরা সেটা প্রয়োগ করেছে, তাহরীরও প্রয়োগ করছে।

হামাসও কম বেশি প্রয়োগ করেছে যে কিভাবে অরাজকতার ব্যবস্থাপনা করতে হয়। প্রয়োগ করেনি কেবল দাঈশ। তারা ডিপ্লোমেসীকে (কূটনীতি) অস্বীকার করেছে।

এখন সিরিয়াতে রাজনীতির মাঠে মুজাহিদদের জিততে পারে কিনা দেখার বিষয়। তারা কি আন্তর্জাতিক তাগুতদের হারিয়ে তালিবানদের মত ইমারাহ করতে পারে কিনা।

কারণ আল-কায়দার মেইন গ্লোবাল জিহাদ তো এটাই যে সাপের মাথা আমেরিকার ইনফ্লুয়েন্স (প্রভাব) যেন এতটা কমে যায়। বিপ্লবের পর যেন তা ছিনতাই না করে এনজিও সরকার, পুতুল সরকার, তাদের দিক্ষায় দিক্ষিত সরকার এবং সিস্টেম বসিয়ে দিতে না পরে।

জায়োনিষ্টদের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কে আমরা নিরব কেন?

জায়োনিষ্টদের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে আমরা খুব সরব থাকলেও, জায়োনিষ্টদের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক নিয়ে আমরা তেমনটা একটা ওয়াকিবহলো না। জায়োনিষ্টদের রাষ্ট্রের বড় একটা অংশ কিন্তু রাশিয়ান ডুয়েল সিটিজেনশীপ রাখে।

এমনকি রাশিয়ানদের বাণিজ্য সেক্টরেও রাশান জায়োনিষ্টদের বড় সিন্ডিকেট আছে। যেমন আমার যতটুকু মনে পড়ে যে, ইংল্যান্ডের চেলসি ফুটবল ক্লাবের মালিক একজন রাশান জায়োনিষ্ট।

এরকম আরো অনেক সেক্টদের দেখবেন যে রাশান জায়োনিষ্টরা খুব প্রিভিলেজড। তারাও পর্দার আড়ালেই বেশী থাকে। তাই এটা খুব স্বাভাবিক যে রাশিয়াতে জায়োনিষ্ট লবী খুবই শক্তিশালী।

অনলাইনে রাশান ফ্যানবয়রা জায়োনিষ্টদের ১৮ গোষ্ঠি উদ্ধার করলেও, তাদের পুতিন আব্বা কিন্তু কখনোই জায়োনিষ্টদের বিরুদ্ধে তেমন কিছু করে না। এমনকি রাশাতে আইসিস হামলা করার পরও যখন লোকজন বলতেছিল এটা জায়োনিষ্টদের কাজ যা তা আইসিসকে দিয়ে করিয়েছে।

অথচ পুতিন কিন্তু তার দেশের জায়োনিষ্টদের লবী, তাদের নেটওয়ার্কের উপর কোন ক্র্যাকডাউন চালায় নি। অর্থাৎ এসব প্রোপাগান্ডা হচ্ছে মূর্খ সমর্থকদের জন্য।

এবং রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব করে ইরানও আসলে তেমন কিছুই করতে পারবে না, কারণ রাশিয়া নিজ স্বার্থ শেষে ইরানের জন্য জান-মাল সব দিয়ে দিবে না। যেখানে ইরানীরা সারা বিশ্ব থেকে শিয়া তরুণদের জমা করে তাদের দিয়ে ফিল্ডে লড়িয়েছে। এতে তাদের অর্থনীতি থেকে শুরু করে, জনবল এবং ইমেইজ অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে। অথচ বাশার নিজেই ইরানের যে লক্ষ্য সেটার প্রতি লয়েল ছিল না। কারণ বাশারের একচুয়ালি (প্রকৃতপক্ষে) ধর্ম-কর্ম নিয়ে তেমন কোন মাথা ব্যাথা নেই। পুরো নুসাইরী সেক্টটাই এমন।

খ্রিষ্টবাদ থেকে শিয়াইসমের কনভার্ট হয়েও তারা গত হাজার বছর আসলে কখনোই ইসলাম প্র্যাক্টিস করেনি। তারাইভেন জায়োনিষ্ট আর খ্রিষ্টানদের থেকে নিকৃষ্ট এবং গডলেস। তাদের যারা দুনিয়া দিবে, তারা তার পক্ষে।

এই বাশারকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইরান এত কিছু করেছে। এমনকি ৪০ বছর আগে খোমেনীর কাছে মুসলিম ব্রাদারহুড হেল্প চাইলেও, সে তা না করে বাশারের বাপ হাফিজ আল-আসাদের পক্ষে গিয়েছিল। অথচ তখন ইরান ব্রাদারহুডকে সমর্থন করে ক্ষমতা আনতে পারলে হয় সত্যিই শিয়া সুন্নী ঐক্য করে জায়োনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়তে পারতো। কিন্তু ইরান তা করেনি।

কারণ ইরান ইনসিকিউরিটিতে (নিরাপত্তাহীনতায়) ভুগে যে, সুন্নী মুসলিম ব্রাদারহুড শক্তিশীল হলে তো আল্টিমেটলি (শেষ পর্যন্ত) নেতৃত্ব তাদের হাতে থাকছে না। এখন হামাসকে সাপোর্ট করে, কারণ তারা বাধ্য। ফালিস্তিনে তো কোন শিয়া গ্রুপ নেই। এমনকি তারা চেষ্টা করেছিল শিয়া দাওয়াহ-তালিম সেন্টার খুলতে। হামাস টেকনিক্যালি সেগুলা দমন করেছে।

বাশারের প্রতি ইরানে এত ইনভেসমেন্ট, কিন্তু যখনই বাশারকে লোভ দেখালো আরবরা, তখন সে সেইদিকে ঝুকে পড়লো। গাযযার যুদ্ধের কারণে হিজবুল্লাহ যখন জায়োনিষ্টদের সাথে মুখোমুখি তখন বাশার আসলে নিষ্ক্রিয় ছিল। এমন কথা ভেসে আসছে যে ইরান তাকে অগ্রগামী করতে পারছিল না।

আবার ওইদিকে রাশিয়াও জায়োনিষ্টদের বিরুদ্ধে এয়ার সাপোর্ট দিতে রাজি হচ্ছিল না। অর্থাৎ প্রথমে রাশিয়া, তারপর বাশার উভয়েই ইরানকে জায়োনিষ্টদের বিরুদ্ধে সাপোর্ট দেয় নাই। অথচ ইউক্রেন যুদ্ধে ইরান রাশানদের অনেক ড্রোন সাপ্লাই দিয়েছে।

চিন্তা করেন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় রাশিয়া শিয়াদেরকে এয়ার সাপোর্ট দিয়েছে, অথচ জায়োনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় রাশিয়া হিজবুল্লাহকে এয়ার সাপোর্ট দেয় নাই। চিন্তা করেন, হিজবুল্লাহ এয়ার সাপোর্ট পেলে কি তাদের এই যে অপমানজনক চুক্তি করতে বাধ্য হলো জায়োনিষ্টদের সাথে, তা করা লাগতো?

আমেরিকা বা রাশিয়ার সাথে জোট করে আমাদের কি লাভ যদি না আমরা তাদের এয়ার সাপোর্ট, এয়ার ডিফেন্সই ব্যবহার করতে না পারি? বরং তারা নিজেদের স্বার্থের সবটুকু নিবে, কিন্তু করার বেলায় ঠুলা। শিয়া-সুন্নী উভয়ের বেলায়ই।

আফগানে আমরা রাশিয়াকে পারজিত করলাম, আমেরিকা নিজে আসতে পারতো না। ফিল্ডে মুসলিমরা ছিল দেখেই আসতে পেরেছে। যেমনটা ৭১ এ মুসলিম বাঙালিরা মুসলিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়ে জিতেছে। ইন্ডিয়ানরা নিজেরা শুধু যুদ্ধ করতে গেলে কিন্তু পারতো না। তারা তাদের সুবিধাটুকু নিয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের বেওকুফীর কারণে নিজেদের সুবিধাটা নিতে পারিনি।

কারণ আমার ইসলামের আক্বীদাকে রাজনীতি, কূটনীতির নামে জালাঞ্জলি দিয়ে, না রাজনীতি আর কূটনীতির মাঠে জয়ী হয়েছি, আর না ইসলামকে ধরে রেখেছি। আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে হিসাব থেকে বাদ দেয়ার ফলাফল হলো, আল্লাহ আমাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেন। দেখো তোমরা যা পারো নিজেরা করো। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন সাথে থাকলে, তিনি সাহায্য পাঠাবেনই, বরকত এবং রহমত ঢেলে দিবেনই।

ইরান জায়োনিষ্টদের সাথে সরাসরি লাগতে চায় না, এর কারণ হলো তার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিবে জায়োনিষ্টরা, আর আরবরা তাকে হেল্পও করবে না। তারা চায় আরবরা জায়োনিষ্টদের সাথে লড়াই করুক, আবার আরবরাও চায় ইরান নিজে আগে যাক। কারণ এরা প্রত্যেকেই আল-কুদসের থেকে নিজেদের বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

ইরান অস্থিরতা দেখায় কারণ তার আল-কুদসের দখল পাওয়ার স্বপ্ন আছে। এর আগে ইসমাইলি শিয়ারা তাদের উবাইদী সালাতানাত তথা ফাতিমী খিলাফাত নামে আল-কুদসের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল আব্বাসী খিলাফতের প্রতিনিধি সেলজুকদের কাছ থেকে। তারপর শিয়াদের থেকে ক্রুসেডাররা আল-কুদস নিয়ে নিয়েছিল।

এর শত বছর পর, সুলতান সালাহউদ্দিন আবারও আল-কুদস জয় করেন, এর আগে ওই ইসলামাইলি শিয়াদের তথাকথিত ফাতিমী খিলাফতও বিলুপ্ত করেন।

কিন্তু ইরানের শিয়ারা কিন্তু ইসমাইলী না, এরা হচ্ছে ১২ ইমামে বিশ্বাসী ইসনা আশারিয়া। এরা হচ্ছে ইরানের সাফাভী সাম্রাজ্যের সন্তান, যারা আল -কুদস শাসনে স্বাদ কখনো পায় নি। এটা তাদের স্বপ্ন। তথাকথিত আরব শাসকদের আল-কুদস শাসন করার স্বপ্নটা নেই। তাই তাদের টিকিয়ে রেখেছে আমেরিকা, নতুবা তাদের গদিও আর থাকবে না।

কিন্তু সুন্নী মুজাহিদ এখন সেটা হোক লোকাল অথবা গ্লোবাল, আল-কুদস তাদের হৃদয়ে। তাদের কোন গ্রুপকেই আমেরিকা-জায়োনিষ্টরা সহ্য করবে না। হয়ত পলিটিক্সের কারণে কখনো কখনো নরমপন্থা অবলম্বন করবে, কিন্তু তারা সুযোগ পেলেই ক্ষতি করবে। যেমন এই মূহর্তে সিরিয়ার মু_জাহিদদের সাথে আমেরিকা-জায়োনিষ্টরা ফুল স্কেলে যুদ্ধে যেতে পারবে না। তাই তাদের পলিটিকাল প্রেশার দিবে, কিছু এয়ার স্ট্রাইক করবে।

তাদের হাতে যেতে পারে এরকম অস্ত্রভান্ডারগুলো ধ্বংস করবে, এবং মাঠে তাদের প্রক্সি সেক্যুলার, ন্যাশেনালিস্ট, মার্কিসিস্টদের লেলিয়ে দিবে লড়ার জন্য। জায়োনিষ্টরা গোলান মালভূমিতে বাফার জোন ক্রিয়েট করছে যেন মু_জাহিদদের সামনে অল্প হলেও কিছু বাঁধা আগে থেকে তৈরী করে রাখা যায়।

কারাগার শুধু বন্দীশালা নয়!

যখন জাস্ট ৫ মিনিটস পড়ছিলাম, তখন মনে হয়েছিল এত কষ্ট কিভাবে সম্ভব! এখন জেল ভাঙার পর যে কাহিনী গুলো শুনতেসি, সেটা ওই জাস্ট ৫ মিনিটস এর বর্ণনার চেয়েও ভয়ংকর। বরং ওনার সময় তথা ৪০ বছর আগে যারা বন্দী হয়েছিল, তাদের অনেকে এখন মুক্ত হলো, অনেকে সেখানেই শহীদ হয়েছে। মনে হচ্ছে, ওই বোনের ৯ বছর যেন কিছুই না। ওই বোন বেঁচে গিয়েছেন।

অর্থাৎ আমরা এক আফিয়ার কথা জানলেও এরকম শতশত আফিয়ারা বন্দী আছে, তাগুতদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। আমরা তাদের খবর জানি না,রাখি না।

তবে আমেরিকানরা যে অত্যাচারের জন্য মিশর-সিরিয়া এমনকি আরবে আরো কিছু রাষ্ট্রে যেমন আরব আমিরাত, সাউদীতে পাঠাতো এটা আমি আগে থেকেই জানি।

আল-জাজিজার একজন সুদানী সাংবাদিক মানসুর আদায়ফি কে আল-কায়দা বলে বিক্রি করে দেয়া হয় আমেরিকার কাছে। তিনি গুয়েন্তানামোতে ছিলেন। তার লেখা বইটা বাংলাতে "বিস্মৃতির অন্তরালে" নামে অনুবাদ করা হয়েছে। সেখানে এসব বিষয়ে আরো জানতে পারবেন।

আমেরিকানরা আসলে এরকম নির্যাতন করে, এবং করিয়ে মজা পায়। মূলত এসব রাষ্ট্রগুলোতে আমেরিকাতেও যে তথাকথিত মানবাধিকার আছে, সেটাও নেই - তখন তারা অনেককে এইসব দেশে নির্যাতনে জন্য পাঠিয়ে দেয়, যেমন আমাদের শিক্ষক আবু মু'সআব আস-সুরীকে তারা পাঠিয়েছে।

একজন জিজ্ঞেস করছিল এতজন মানুষকে বন্দী করে রেখে এরা কি মজা পায়? বন্দীদের খাওয়াতে হয়, পাহারা দিতে হয়, এগুলো এক্সট্রা প্যারা না? তারা কেন এমন করে?

আমার অভিজ্ঞতা বলে যে, তারা এগুলো করে, বন্দীদের কষ্ট দেখে মজা পায়। আমি নিজের চোখে সেটা দেখেছি, নিজে অনুভব করেছি যখন বন্দী ছিলাম। এবং তারা এই বিষয়গুলো কম বেশী প্রমাণ ছাড়া প্রচারও হতে দেয়, যেন মানুষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

যেমন ইরাকের আবু গারিব কারাগারে[14] আমেরিকান সেনাদের দ্বারা মুসলিমদের লাঞ্ছিত এবং নির্যাতনের চিত্রগুলো ফাঁস করেছিল কারা যেন? তাদেরই লোকজন। অথচ এর জন্য আমেরিকার যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায় নি, বরং মানুষ সেগুলো দেখে আতঙ্কিত হয়েছিল। তার উপর বাশারের কারাগারেও অনেক কিছু আগে ভাইরাল হয়েছিল যে, বন্দীদের খাবার না দেয়ার কারণে একেবারে শুটকির মত হয়ে আছে এমন ছবি। নেটে সার্চ করলেই পাবেন এগুলো।

তারা কষ্ট দিয়ে মারতে পছন্দ করে। আমি গুমে থাকতে ভাবতাম যে, তারা আমাদের খাওয়াই বা দিচ্ছে কেন? তখন তাদের প্যাটার্ন দেখে রিয়েলাইজ (ধারণা/অনুভব) হলো যে, তারা আপনাকে কোন রকম বেঁচে থাকার জন্য কিছু খাবার দিবে যেন, আপনি মরে না যান। কারণ মরে গেলে কষ্ট পেলাম কম। কিন্তু এতটা খাবার দিবে না, যেটাতে ক্ষুধার জ্বালা মিটবে। এতটা ভালো খাবার দিবে না যে, তৃপ্তি নিয়ে খেতে পারবো। নূন্যতম কিছু খাবার দিবে, সেটাও আবার নোংরা, পঁচা, বাসি।

তারা বিষয়টা উপভোগ করতো। দীর্ঘ কারাবাস থেকে অনেক সময় ক্রস ফায়ার ভালো। কারণ মৃত্যু ইসপার নয়ত উসপার। কিন্তু বন্দী রেখে ধুঁকে ধুঁকে মরাটা, কিংবা না মরে বেঁচে থাকাটা অনেক কষ্টের। তার উপর নির্যাতনের কারণে শারীরিক সমস্যা থাকে, মানসিক অবস্থা কেমন হয় সেটা

---

[14] আবু গারিব কারাগার- https://tinyurl.com/2w25dpf5

আমরা কল্পনা করতে পারবো না। এমনকি আমি নিজে বলছি যে আমরা অনেক অনেক ভালো ছিলাম, যেরকমটা শুনছি সিরিয়ার ক্ষেত্রে।

আল্লাহ তা'আলা সব কিছু দেখছেন। সবকিছুর বিচার হবে। আমাদের কিছু বলে দেয়া লাগবে না। তিনি সব জানেন এবং দেখেন।

আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আল-জুলানী এবং আল-কায়দা

আন্তর্জাতিক মিডিয়া একটা খবর খুব সার্কুলেট হচ্ছে যে, আল-জুলানী আগে যখন আল-কায়দাতে ছিলেন, তখন আসলে সিরিয়াতে সংখ্যা লঘুদের অধিকারে বিশ্বাস করতেন না। তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার কথা বলতেন।

তবে এখন ভালো হয়ে গিয়েছেন। এখন তিনি সিরিয়দের সকলকে সাথে নিয়ে দেশ গড়তে চান। দেশীয় অনেক মিডিয়া এটা কাভার করেছে। এগুলা সত্যের সাথে মিথ্যা মিশানো কথাবার্তা।

অথচ বাস্তবতা হলো, হায়াতু তাহরীর আশ-শাম যখন জাবহাত আন-নুসরাহ তথা আল-কায়দা ছিল, তখনো তারা সিরিয়ার খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের এ্যাটাক করেনি। বরং আপনারা ইউটিউব খুঁজলেই পাবেন যে, তারা অনেক চার্চ, নান সাধারণ খ্রিষ্টান এমনকি শিয়াদেরও প্রোটেকশন দিয়েছে।

কিছু ঘটনা যেমন আওয়ামী লীগের হিন্দুদের সাথে হয়েছে, যেটা আসলে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইস্যু না, সেরকম ঘটনা শিয়াদের সাথে হয়েছিল, এবং আমি যখন এই লেখা লিখছি তখনও হচ্ছে - কারণ সেটা রাজনৈতিক এবং অপরাধী যায়া তাদের সাথে হচ্ছে, যদিও তিনি নিষেধ করেছেন, কিন্তু জনগণ মানছে না।

শুধু নুসাইরী শিয়া-ই না বরং সুন্নীদের মধ্যে যারা বাশার আল-আসাদের সমর্থক ছিল, যেমন প্রখ্যাত আলেম রমজান বুতি বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে নিহত হন। এবং গতকাল কারা যেন তার ছেলেকে নিহত করে। এখন আল-জুলানী তো বলেছেন তিনি প্রতিশোধ নিবেন না, কিন্তু তার পরও যা হবার হচ্ছে।

তাই আল-কায়দার সময় খারাপ ছিল, এখন ভালো হয়ে গিয়েছে বিষয়টা মোটেও তেমন না। বরং আমার অভিজ্ঞতা বলে আল-কায়দা অনেক বেশী নরম তার প্রতিপক্ষের বেলায়, যেটার জন্য তাদের ভুগতে হয় - সুশীল যেটাকে আমরা বলি - আল-জুলানী ততটা নরম মানুষ না।

কিন্তু মিডিয়াতে আল-কায়দার ব্যাপারে একটা পারসেপশন (কল্পমূর্তি) বানিয়ে রাখা হয়েছে, এবং অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীও সেই পারসেপশনে বিশ্বাস করে উগ্র হওয়ার চেষ্টা করে এই ভেবে যে, আল-কায়দার মত হওয়া যাবে। বিষয়টা আসলে বাস্তবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

আপনি আল-কায়দা অফিশিয়াল, এমনকি তাহরীরও অফিশিয়াল কোন কিছু, এমনকি গোপণ কোন কিছুতে এগুলো কখনোই পাবেন না যে, তারা সংখ্যালঘুর উপর, দুর্বলের আগ্রাসন চালাতে বলে। গেরিলা যুদ্ধের একটা মেইন থীমই হলো যে, যারা আপনার পথের কাঁটা না, তাদের সাথে গ্যাঞ্জাম করে অযথা বোঝা বা চাপ না নেওয়া।

পার্শীয় যুদ্ধে জড়ানো যাবে। যেখানে অস্ত্রধারী ছোট শত্রুদের সাথে শান্তি চুক্তি করে বড় শত্রুকে বধ করার কথা বলে, সেখানে অস্ত্রহীন কাফিরদের সাথে সংঘর্ষে যাওয়া পুরো বিপরীত কার্যক্ষম কাজ। এগুলো শত্রুপক্ষ মিডিয়া ওয়ারফেয়ারের অংশ হিসেবে প্রচার করে, আর আমরাও সেগুলোতে প্রভাবিত হই। অনেক সময়ই সেই উসকানীতে পা দিয়ে দেই।

আল-জুলানীর ব্যাপারে আরেকটা ইন্টারেস্টিং তথ্য শেয়ার করি। যখন তাহরীর আশ-শাম গঠন করা হয়, তখন তিনি কিন্তু হেড ছিলেন না। যাকে হেড বানাই ছিলেন তারে প্রায় পুতুল বানিয়ে ফেলছিল। এরপর চান্সে আল -জুলানী নিজেই ফুল লীডটা (পুরো নেতৃত্ব) নিয়ে নেন।

এখন তিন হেড না হয়ে আরেক জনকে সরকারে দিলেন, অন্যাদের দিয়ে প্রশাসন চালাবেন। কিছুটা ইদলিব টাইপের হবে। কোর্টগুলো ইদলিবের মতই শরীয়াহ কোর্ট দিয়ে পরিচালিত হবে। আর সরকার ব্যবস্থা কিছুটা অস্পষ্ট থাকবে।

সেক্যুলাররা তাহরীর ডিসলভ (অবসান/বিলুপ্ত) করার জন্য চাপ দিবে। তিনিও করবেন করবেন বলে আশ্বাস দিতে থাকবেন - এদিকে জনগণের মধ্যে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে কিছু ক্যাম্পেইন চালাবেন। তাহরীর তখনই ডিসলভ (অবসান/বিলুপ্ত) করবেন, যখন এর চেয়ে বেটার কোন প্লাটফর্ম এবং শক্তিশালী অস্তিত্বর ক্ষমতা তিনি হাতে পাবেন। তার কিন্তু সবার উপরে সমান নিয়ন্ত্রণ নেই।

জানি না জায়োনিষ্টরা দামাস্কাস দখল করে ফেলবে কিনা, কিন্তু সেই সক্ষমতা তাদের আছে সেটা তারা বুঝিয়ে দিলো। তাই তারা টেনশন সৃষ্টি করলে আপনি যতই বলুন সিরিয়ার আগে স্থিতিশীলতা দরকার সেটা আসলে আর হবে না। বরং শেষ ২ সপ্তাহ ফ্রি ভেবে এখনো আগের মত প্রস্তুতি নিয়ে লড়াইয়ের মানসিকতা রাখতে হবে।

সেক্যুলার আর জায়োনিষ্টদের দিয়ে চাপে রেখে আমেরিকা চেষ্টা করবে কোনভাবেই যেন কোন ইসলামি ইমারাহ তৈরী না হয়। অনেকটা সফলও হবে। কিন্তু গণতন্ত্র-ফনতন্ত্র, নির্বাচন এসব আশা করি দেখবেন না। আল-জুলানী এত নাইভ না, কারণ এসবে গেলে তিনি নিশ্চিত ক্ষমতা হারাবেন। এটা তার চরিত্রের সাথে যায় না। খুব বেশী হলে কিছু লোকের মাধ্যমে শো অফ কিছু করাতে পারেন, কিন্তু নিজে নির্বাচন-টির্বাচন করবেন না। আর সিরিয়ার পরিস্থিতি ওই পর্যায়ে যাওয়াটাও কঠিন।

মধ্যপ্রাচ্যের একটি সংশয় নিরসন এবং ভারত-বাংলাদেশ

অনেকে মনে করেন যে একটু ন্যাশনালিস্টিক (জাতীয়করণ) সুর দিলে হয়ত কাফিররা বেশী স্পেস দিবে। হ্যাঁ দিবে, কিন্তু তারা তাদের ধারালো ছুরি ভোতা করবে না।

বিষয়টা হলো জায়োনিষ্টরা সিরিয়াতে এই সুযোগে যতরকম অস্ত্র-গোলা আছে সব ধ্বংস করে দিচ্ছে। গোলান মালভূমি দখল করে, আরো সামনে পর্যন্ত চলে আসছে। অথচ এই যে বর্ডার নামক আন্তার্জিতক চুক্তি ভঙ্গ করে বসে আছে, আমেরিকা-জাতিসংঘ চুপ।

এটা দেখার পরও অনেকে মনে করে যে, আমেরিকাতে লবি করে, তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে ভারতকে ঠেকিয়ে দেয়া যাবে। ভারত ভুলেও বাংলাদেশের বর্ডারে এভাবে সুযোগ বুঝে ঢুকবে না। বরং জায়োনিষ্টদের এই কাজটার ফলাফল হলো ভারতও এরকম কাজ করতে উৎসাহ পাবে।

বরং সমস্যাটা হলো আমাদের মুসলিমদের যে, তারা এই আন্তার্জিতক আইনকে সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছে। আক্ষরিক বুঝের লোকদের মানুষজন যেমন গালাগাল করে, মুসলিমদের অবস্থা হইসে ঠিক সেই রকম যে, তারা কাফিরদের চাইতে বেশী আন্তর্জাতিক আইন মানে, কাফিরদের চাইতেও বেশী সেক্যুলার, কাফিরদের চাইতে বেশী গণতান্ত্রিক।

এরকম করতে করতে যখন আমরা কিছু ব্যতিক্রম করি, তারা চেপে বসার সুযোগ পায়। অথচ আমার আগে থেকে নতজানু না হলে, তাদের আরো দরকষাকষি করতে হতো। অথচ আমরা এখন আগ বাড়িয়ে কুকুরের মত লেজ নাড়াতে নাড়াতে তাদের দেয়া শিকল গলায় পড়ি।

একটা সাক্ষাৎকার দেখছিলাম যে, ওয়েস্টের কিছু সাথে মুসলিম বিশ্বের কিছু এনালাইস্টরা আলোচনা করছে যে, সিরিয়ানরা নাকি সংবিধান বানাতে পারবে না, কন্ট্রোল করতে পারবে না, তাই জাতিসংঘের উচিত হস্তক্ষেপ করে তাদের জন্য সংবিধান বানিয়ে দেয়া। কতবড় সাহস দেখাতে চাচ্ছে দেখেন!

সিরিয়া যদি স্বাধীন সার্বভৌম হয়, জাতিসংঘ কে হস্তক্ষেপ করার? অথচ এদিকে জায়োনিষ্টরা স্বাধীন সার্বভৌমত্বের এইসি কি তেইসি করতেসে, সেই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহল নামক বিশ্ব তাগুতরা চুপ। আরবরা কুঁই কুঁই করে শুধু নিন্দা জানাইতেসে।

যতদিন না মুসলিমরা এই আন্তর্জিতক মহলে এবং তাদের আইনকে অস্বীকার না করবে, যতদিন তারা কুফর, তাগুতকে[15] অস্বীকার না করবে, আল্লাহর কসম তাদের জিল্লাতি (অপমান/অসম্মান) কখনোই থামবে না। আল-কুদস হলো পবিত্র, এর অধিকার তারাই পাবে যারা এই বিশ্ব তাগুতদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে না বরং প্রতিরোধী হবে। এবং অবশ্যই আল্লাহকে ভালোবাসবে, মু'মিনদের ভালোবাসবে, কোন নিন্দার পরেয়া করবে না।

সিরিয়া দ্যা সেন্টার অফ গ্লোবাল ব্যাটেল

৮০ 'র দশকে যখন আফগানে বিদেশি মুসলিম ফাইটাররা (যোদ্ধা) আসা শুরু করে তখন মুসলিম তরুণদের এরকম জান-মাল কুরবান করা, দ্বীন এবং উম্মাহর প্রতি ভালোবাসা দেখে শাইখ আযযাম গ্লোবাল মুসলিম আর্মি বানানোর চিন্তা করেন। যারা কিনা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় লড়াই করবে।

---

[15] তাগুত শব্দের অর্থ সীমালজ্ঘন করা। অবাধ্যতা, জুলুম বা অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা লজ্ঘনকারীকে 'তাগুত' বা 'সীমালজ্ঘনকারী' বলা হয়। আরো জানুন - https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6921

যেহেতু সেখানে (আফগানিস্তানে) অনেক দেশ থেকে ইসলামীপন্থীরা হিজরত করছিল, তারা নিজেদের মধ্যে অলরেডি আলোচনা করা শুরু করে দিয়েছিল যে, তাদের নিজ নিজ দেশে বিভিন্ন আন্দোলনে আসলে তাদের ভুল গুলো কি? কেনো তারা সফল হচ্ছে না? তারা একটা জিনিস খুঁজে বের করলো যে, তারা একটা গোলক ধাঁধায় আটকে গিয়েছে।

আর সেটা হলো, মুসলিমরা বিভিন্ন জায়গায় কম-বেশী বিপ্লবের কাছকাছি গেলেও বিপ্লবটা ধরে রাখতে পারেনি, কারণ আন্তর্জাতিক মহলের মোড়লরা তাদের দেশীয় দালালদের ব্যবহার করে, বিপ্লব ব্যহত করেছে, এবং পুনরায় নিজেদের পুতুলকে বসিয়ে দিয়েছে। আর মুসলিমরা বারবার সেই পুতুলদের বিরুদ্ধে লড়ছে।

এক পুতুলকে ফেললে আরেক পুতুল আসে, আর ওই পশ্চিমাদের সিস্টেম, সিস্টেমের জায়গায়ই আছে। মুসলিমরা কুরবানী দেয়, কিন্তু বিজয় ধরে রাখতে পারে না।

তাহলে উপায় কি? উপায় হলো, স্থানীয় পুতুলদের প্রতিরোধ করে যেতে হবে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু লং রানে সফলতার জন্য - ওই যে আন্তর্জাতিক মহল নামক তাগুতরা আছে, তাদের পাওয়ার ধ্বংস করতে হবে। যেন,তারা আর পুতুল বাসানোর সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং মুসলিমরা ইসলামিক সিস্টেম মুসলিম বিশ্বে চালু করতে পারে।

এই অনুমানের পরও আসলে স্থানীয় পুতুলদের সাথে সংগ্রামে আমরা কতটুকু শক্তি খরচ করবো? এখানেই আল-কায়দার জন্ম নেয় যে, স্থানীয় শত্রুদের সাথে অন্যান্যরা যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করবে, আল-কায়দা তাদের সকল বৈধ কাজের পাশে আছে। কিন্তু আল-কায়দা তার মেইন ফোকাস করবে আন্তার্জাতিক তাগুত, সাপের মাথা আমেরিকার উপর। তার অর্থনীতি ধ্বংস করার উপায় খুঁজতে হবে। তাকে দুর্বল করতে হবে।

বিভিন্ন ফ্রন্টে হয় কি, কখনো কখনো স্থানীয় শত্রু আর আমেরিকার স্বার্থ /সুবিধা পুরোপুরি সেইম থাকে। তখন আল-কায়দা সেখানে খুব সহজে ফলপ্রসূত কাজ করতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন ফ্রন্টে বিশেষ স্থানীয় শত্রু আর আমেরিকার স্বার্থ- দ্বন্দ্ব/ মতবিরোধ থাকতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই স্থানীয়রা আল-কায়দার উদ্দেশ্যের সাথে একমত হতে পারে না।

কারণ স্থানীয় শত্রুকে প্রতিরোধ করতে গেলে আমেরিকাকে প্রতিপক্ষ বানানোর প্রয়োজন পড়ছে না, আমেরিকা এখানে সেকেন্ডারী ইস্যু। আবার আল-কায়দার জন্য আমেরিকা ফার্স্ট প্রায়োরিটি (অগ্রাধিকার)। যেমনটা সিরিয়াতে হয়েছিল যে, আল-কায়দার মেইন স্বার্থের সাথে, সিরিয়ার স্থানীয় ইস্যু তথা বাশারের পতন যে, মেইন বিষয় সেটার মতবিরোধ হচ্ছিল।

আল-কায়দার কারণে অযথা আমেরিকার সাথে ডিল করতে হচ্ছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে ইন্ডিয়া স্থানীয়ভাবে অগ্রাধিকার পাবে, কিন্তু আল-কায়দার মূল মনযোগ তো আমেরিকা। এদিকে আবার ইন্ডিয়া-আমেরিকার ইন্টারেস্টও সেইম।

আল-কায়দা চেষ্টা করে দুইটার সমন্বয় করতে, কিন্তু স্থানীয়রা অনেক সময় বিষয়টা মেনে নেয় না, এবং আল-কায়দাও ঠিকমত বাস্তবায়ন করতে পারে না।

যেমন সিরিয়াতে এতদিন বাশার-ইরান মূল শত্রু থাকলেও তাদের পতনের পর এখন কিন্তু সিরিয়ানদের জন্য মূল শত্রু বাকি রইল জায়োনিষ্ট-আমেরিকা আর তাদের দালালেরা। অর্থাৎ এতদিন সিরিয়ার স্থানীয়দের সাথে আল-কায়দা স্বার্থ-মতবিরোধ-দ্বন্দ্ব থাকলেও, নতুন বাস্তবতায় উভয়ের মেইন ইন্টারেস্ট আবার সেইম হয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ সামনে আরো উত্তম কোনো বাঁধন আমরা গ্লোবাল আর লোকালদের মধ্যে দেখতেই পারি। এরকম আশা করাই যায়, কারণ সিরিয়াতে বিদেশি যোদ্ধা অনেক আছে। যারা কিনা আল-কায়দাপন্থী যদিও তারা নিজেরা ইমারাত চালানোর জন্য লড়ছে না, ফাইটার হিসেবে লড়ছে। যেমনটা

আফগানেও ছিল, আছে - বিভিন্ন দেশের ফরেন ফাইটার (বিদেশি যোদ্ধা)। কিন্তু তারা প্রশাসন চালাতে বসে যায়নি।

সেটা স্থানীয়দের জন্যই। সিরিয়ার আরো বেশী ফাইটার দরকার এখন, ফরেন ফাইটারও। এত সহজ হবে না আসলে সিরিয়ার জন্য গ্লোবাল থেকে পুরোপুরি লোকাল হবার। পরিস্থিতিই তা হতে দিবে না। তবে উপরে লোকাল মাস্ক পরে, ভিতরে গ্লোবাল কাজটা করতে পারলে উত্তম হয়। সবকিছু উন্মুক্ত থাকলে অযথা ঝামেলায় পড়বে।

অর্থাৎ সিরিয়ার জন্য গ্লোবাল ব্যাটলকে ড্রপ করা সম্ভবই না। বরং আগের চেয়ে এটা এখন আরো বেশী প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সেটা নিঃশর্ত ইসলামী ইমারাহ তৈরী থেকে শুরু করে জায়োনিষ্ট-আমেরিকানদের সাথে হেড টু হেড ব্যাটেল, সেটা হোক গেরিলা টেকনিকের ফার্স্ট স্টেজ। অথবা শেষ পর্যায়ে প্রেরণা কাজে লাগিয়ে তীব্র গতিতে দখল।

এটা বাশারের ক্ষেত্রে কাজে লেগেছিল, কারণ তার সেনারা যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত। মুজাহিদরা তার অর্থনীতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল। তাই গেরিলা যুদ্ধের থার্ড স্টেজের নিয়ম অনুযায়ী তারা প্রকাশ্যে শহর দখলের যুদ্ধ শুরু করেছিল।

যখন তারা মোটামুটি বুঝতে পারছিল যে, তারা ফাইট দিবে না, এয়ার স্ট্রাইকও তেমন হবে না। কারণ এতদিন তারা কয়েকটা ফ্যাক্টরের জন্য ওয়েট করছিল। টাইমও মিলেছিল। রাজনৈতিক বোঝাপাড়াও বিভিন্ন প্লেয়ারদের সাথে হয়েছিল।

কিন্তু জায়োনিষ্টদের সাথে বিষয়টা এত সহজ হবে না। কারণ এয়ার স্ট্রাইকের ভয় আছে। জায়োনিষ্টদেরকে গেরিলা যুদ্ধের ফার্স্ট স্টেজ থেকে শুরু করাতে হবে। তাদের অর্থনীতির বারোটা বাজাতে হবে। তাদের সেনাদের ক্লান্ত করে ফেলতে হবে। সমস্যা হলো জায়োনিষ্টরা আসলে আমেরিকার সংযোজিত অংশ।

অর্থাৎ জায়োনিষ্টদের অর্থনীতির ধ্বংস করা মানে আমেরিকার অর্থনীতি ধ্বংস করতে হবে। তাদের সেনাদের ক্লান্ত করে ফেলতে হবে। হামাস কিছুটা করেছে। কিন্তু যথেষ্ট না। কারণ এটা লোকাল গেইম না, এটাই বরং গ্লোবাল গেইম। জায়োনিষ্টদের দিকে ফাইনাল এ্যাটাকে চলে যেতে পারলে আমেরিকা জান-প্রাণ দিয়ে দিবে সেটা রক্ষা করার জন্য। আফগানিস্তানের চেয়েও বেশী খরচ করবে। তাই যুদ্ধটা এতটা সহজ হবে না।

উপমহাদেশের ক্ষেত্রে লোকালদের সাথে আল-কায়দার কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট হয় (স্বার্থের দ্বন্দ্ব)। লোকালরা চাইবে এমন কিছু না করতে যা আমেরিকাকে রাগিয়ে দিবে। তার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আছে, কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে নেই, অথবা চীনের।

এখানে আল-কায়দাকে আসলে প্রমাণ করতে হবে যে, ইন্ডিয়া আর আমেরিকার সম্পর্ক একই, স্বার্থ একই। আমরা চায়নার সাথে হয়ত শান্তি চুক্তি করতে পারি, এমনকি আমেরিকার সাথেও। কিন্তু আমেরিকার উপর ভর করে, ইন্ডিয়াকে পারজিত করা যাবে না।

যেমনটা ব্রাদারহুড এবং হামাস অনেক চেষ্টা করেছে এত বছর ধরে আমেরিকা এবং আন্তর্জাতিক মহলকে না রাগিয়ে, তাদের নীতির মধ্যে থেকে স্থানীয় শত্রু এবং জায়োনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়া। অথচ ওই স্থানীয় শত্রুরা তো সবই আমেরিকার মিত্র। কেন আমেরিকা তাদের ফেলে আপনাকে সাপোর্ট করতে হবে যদি না আপনি তাদের চেয়ে বড় দালাল নিজেকে প্রমাণ করতে না পারেন?

এজন্য তারা বারবার আমেরিকার ধোঁকা খেয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা এভাবে ধোঁকা খাবো সমানে। কারণ ইন্ডিয়া বিরোধী বড় একটা অংশ প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার স্বার্থে এবং তার নীতির মধ্যে থেকে কাজ করার কথা বলবে, এর বিপরীতে যে কোন কিছু তারা শত্রুর জ্ঞান ভাববে। ওইদিকে আমেরিকা তাদেরকে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না, বরং

আমেরিকা নিজ স্বার্থেই ইন্ডিয়ানদের সুবিধা দিবে। আমেরিকাপন্থী লোকগুলো তখন হয় ধোঁকা খাবে, অথবা ইন্ডিয়ানদের সাথে মিলেই কাজ করবে।

যেটা আমরা ইতিমধ্যে দেখছি। শরীয়াহ কায়েম অনেক দূরে। যদিও আল্লাহ চাইলে সহজ। কিন্তু তারা আপনাকে স্থায়ী ক্ষমতার লোভ দেখাবে, আমেরিকার অনুগামী হবার মাধ্যমে, আসলেই সম্ভব! কিন্তু আমেরিকা তো দিন শেষে ইন্ডিয়াকেই সাপোর্ট করবে, যেভাবে জায়োনিষ্টদের করছে।

এক মু'মিন আরেক মু'মিনের আয়না। মধ্য প্রাচ্য আমাদের আয়না। ওখানে আমেরিকা যা করেছে, এখানেও তাই করবে। সিজদা দিলে দুনিয়াতে কিছুদিন আরাম পেতে পারেন, তবুও নিশ্চিত না - কতদিন আরাম থাকবে। আমেরিকা সবসময় চেকে রাখবে আপনাকে, তেড়িবেড়ি করলে শাস্তি দিবে।

পুরো তাদের দ্বীন যদি গ্রহণ করেই ফেলেন, তবে পরকালে আমেরিকার সাথেই থাকবেন।[16] শিক্ষা না নিলে আসলে আপনি নিজেই বাস্তবতায় নাই।

---

[16] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। [জামে' আত-তিরমিজি-২৬৯৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে।" [সুনানে আবু দাউদ - ৪০৩১]

এখানে, বিজাতি বলতে মুসলিম নয় এমন কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি-নাসারা, হিন্দু, বোদ্ধা, খ্রিস্টান....। কাফিরদেরকে অনুসরণ, অনুকরণ, তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না। যদি আমরা ওমুক নায়ক, নায়িকা, খেলোয়াড় স্টাইল করে চুল কেটেছে, ঐভাবে জামা পড়েছে, এভাবে সেজেছে এবং আমরা তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করি তাহলে তাদের দলভুক্ত হয়ে গেলাম! এখন আপনি ভাবেন কাফির জাহান্নামে যাবে, আপনি তাকে অনুসরণ করলেন আপনার অবস্থাটা কি হবে? তাই এই পথ থেকে ফিরে এসে তওবা করুন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দেখানো পথে চলতে শিখুন।

আপনি আছেন কেবল আপনার সুবিধা নিয়ে।

আর আপনার যা ভাবতে ভাল লাগে তা নিয়ে। মু'মিনরা এক গর্তে বারবার পড়ে না। কিন্তু আমরা পড়ছি। আমরা বারবার আমেরিকার সাহায্যে আমেরিকার মিত্রদের পারজিত করার চিন্তা করছি। আমেরিকা এবং তার ধর্ম সেক্যুলারিজম, তার সিস্টেম ডেমোক্রেসি দিয়ে আপনি কখনোই ইন্ডিয়াকে মোকাবেলা করতে পারবে না। ইন্ডিয়া আপনাকে গ্রাস করে ফেলবে, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিশ্ব কিছুই করবে না। রোড ম্যাপ কি কিছুটা পেলেন?

আল-কায়দার কার্যপদ্ধতি ও কৌশল

একটা বাস্তব সমস্যাকে কাল্পনিক আকারে প্রকাশ করবো। যেমন আমরা সবাই এখন ভারতের বিরুদ্ধে। সেক্যুলার থেকে শুরু করে ইসলামিস্ট। অন্তত আপাত দৃষ্টিতে। সরকার এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি একই যে,

ভারত আমাদের নিজের কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। এরকম পরিস্থিতিতে আল-কায়দা কি বাংলাদেশের ইন্টালিজেন্সের সাথে কাজ করবে?

যেমন আমাদের অনেক আলেমগণ বলেন যে, সরকার ঘোষণা দেক, আমরা আবার আগে জিহাদ করবো। কিংবা গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থী দলগুলোর চিন্তা এরকম যে, শত্রু রাষ্ট্রের ব্যাপারে আমাদের সবার অবস্থান যেখানে একই, সেখানে আমাদের সমতুল্য হয়ে কাজ করা উচিত।

কিন্তু আল-কায়দা এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে কি করে? ধরুন এরকম একটা পরিস্থিতি হলো যে, শত্রু রাষ্ট্র যেমন ভারত কিংবা মিয়ানমার এর বিরুদ্ধে সেক্যুলার কিংবা ধরুন ইসলামী গণতন্ত্রপন্থী সরকারের সাথে আল-কায়দার ইন্টারেস্ট মিলে গেলো।এখন তাদের উচিত না একে অপরের বিরুদ্ধে ফাইট করেনিজেদের শক্তি ক্ষয় করা। এ বিষয়ে সবাই একমত হবে। এমনকি আল-কায়দা-ও। এখন হচ্ছে কো-অর্ডিনেটের পালা।

ইন্টেলিজেন্ট এজেন্সী গুলো স্বভাবগত ভাবেই, আল-কায়দার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলো জানার চেষ্টা করবে। কিন্তু আল-কায়দা কারো প্রক্সি হতে রাজি না। কিন্তু প্রক্সি না হলে, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী স্টেইটের তথ্যগুলো দিবে না। তথ্য পেলে একটা গেরিলা কিংবা আল-কায়দা টাইপ কভার্ট অর্গানাইজেশন কতটা ভয়ংকর এবং কার্যকর হতে পারে, তা আপনারা একটু অনুধাবন করুন।

আল-কায়দা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয় যে, এরকম কোন রাষ্ট্রের সাথে লিঁয়াজু করতে গেলে, ওই রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স চেষ্টা করে সব তথ্য নিয়ে নিতে।

তারপর হয় কি, কোন মতবিরোধ হলেই তারা গুপ্ত হত্যা শুরু করে, অথবা একেবারেই ধ্বংস করে দেয়। কখনো নিজেরা, কখনো কাফিরদের সাথে হাত মিলিয়ে।

বাংলাদেশের হুজি এবং জেএমবি কথাই চিন্তা করুন। তাদের সব তথ্য ইন্টেলিজেন্সের কাছে ছিল, কারণ তারা তাদের বিশ্বাস করেছিল, তাই পুরো সংগঠনকে প্যাক করে ফেলতে বাংলাদেশ সরকারের বেশী সময় লাগে নি।

আল-কায়দা তো ইরানের সাথে মিলেও কাজ করেছে, প্রয়োজনে চুক্তিতেও গিয়েছে। কিন্তু নিজেদের সব ওপেন করে দেয়নি যেন ইরান আল-কায়দাকে নিজেদের প্রক্সি হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। কারণ সব ওপেন হয়ে গেলে তারা ব্ল্যাক মেইল করবে।

হয় তাদের আনুগত্য করতে হবে। নতুবা তারা শেষ করে দিবে। তারপরও ২০২০ তেহরানে আল-কায়দার সেকেন্ড ইন কমান্ড আবু মুহাম্মাদ আল-মাসরীকে মোসাদ গুপ্তহত্যা করে, ঠিক ইসমাইল হানিয়ার মত। এখন ইরান নিজেই কি মোসাদকে এই তথ্য দিয়েছিল কিনা কে জানে।

তারপর এভাবে তুর্কি এবং পাকিস্তানের ইন্টেলিজেন্সের সাথে শরঈ সীমার মধ্যে থেকে কাজ করতে আল-কায়দা নিষেধ করে না। কিন্তু আল-কায়দা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়। তালিবানরা প্রথম যখন ক্ষমতায় এসেছিল, তখন পাকিস্তানের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল।

কিন্তু ২০০১ এর পর, তালিবান এবং আল-কায়দার লীডরদের ধরতে আমেরিকাকে সবচাইতে বেশী সাহায্য করেছে ওই পাকিস্তানের ইন্টেলিজেন্স। ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে ইসলামপন্থীদের জেনুইন সমর্থকও থাকে।

কিন্তু সেক্যুলাররাও থাকে। শত্রুদের গুপ্তচরও থাকে। আবার বিক্রি হয়ে যাওয়া, কিংবা লোভী, কিংবা বিভ্রান্ত লোকেরাও থাকে।

এখন তুর্কির সাথে সময় ভালো যাচ্ছে সিরিয়ার মুজাহিদদের। এখন আমি জানি না, তুর্কি ইন্টেলিজেন্সের কাছে মুজাহিদদের ফুল স্ট্র্যাকচারের ব্যাপারে কতটুকু তথ্য আছে।

কিন্তু তারা তাদের কাছে ধরা। সবাইরে তো মারতে হয় না, কোন কোন লীডরা কোন কোন পজিশনে আছে তা শুধু জানতে হয়। ধরেন আমেরিকা তুর্কিকে বললো, কোন ভাবেই যেন ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত না হয়। তুর্কি আল-জুলানীকে বললো, দেখো যা করার করো, কিন্তু এইটা কইরো না। নির্বাচন দেয়ার ট্রাই করো।

আল-জুলানী এখন কি করবে? গণতন্ত্রে যাবে? যদি না যায়? তুর্কির কাছে কিন্তু তথ্য আছে পুরা হাই'য়াতের। আল-জুলানী না হয় একজন প্রকাশ্যে ঘুরছে আমেরিকান ড্রোন স্ট্রাইকের ভয় ছাড়াই। ধরেন তিনি একজন কম্প্রোমাইজ করলেন যে, কোর্ট শরীয়াহ থাকুক, কিন্তু আমি নির্বাচন দিবো।

তেড়িবেড়ি করলে শুধু একজন মারা যাবে, বাকি সংগঠন তো টিকে থাকবে, লীডার তো আছে। দেখার বিষয় হলো বাকি লীডাররাও নজরদারিতে আছে কিনা? থাকলে কতটুকু? তুর্কির সাপোর্ট এবং তথ্য ব্যবহারের জন্য। মোটকথা দামাস্কাস বিজয়ের জন্য তারা বাধ্য হয়েছে তুর্কির কাছে ওপেন হতে।

এই বিষয়টা নিয়ে নিশ্চয়ই মতভেদ হবার কথা বিজয়ের আগে। আমি একটা রিস্ক নিচ্ছি, কিন্তু এরপরও বিজয় আসবে কিনা নিশ্চিত না,তাই না? তখন সিরিয়ার মুজাহিদ লীডাররা, আলেমরা নিজেদের মধ্যে মত বিরোধ করেছে।

এমনকি এটা এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, একে অপরকে সন্দেহ এবং তুর্কির ইন্টেলিজেন্সের কাছে অন্যদের তথ্য দিয়ে দেয়ার অভিযোগ পর্যন্ত আছে।

এই যে স্ট্র্যাটিজিকাল বিষয়ে মতভেদ এবং ক্ষমতার দ্বন্দ, এগুলো আপনি খুব বেশী মানুষের কাছে শুনবেন না। শাইখ মাকদিসি যখন আল-জুলানীর সমালোচনা করেন, তখন এইগুলো পয়েন্ট আউট করেই করেন, কারণ তিনি তুর্কিকে বিশ্বাস করেন না।

স্বাভাবিক না এর আগে এরকম অভিজ্ঞতা কি বলে? কে কার কাছে এখন ধরা? শরীয়াহ কায়েমের ঘোষণা দিতেও ইতস্ত করতে হচ্ছে, কারণ তুর্কির কাছে এখানে শরীয়াহ কায়েম না কায়েম ইস্যু না। আবার তুর্কি যদি আমেরিকানদেরও ইন্টেল দেয় কিনা, যেটা আসলে ন্যাটো হবার কারণে তারা দিতে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য, তখন?

তো তখন মতভেদ হয়েছে, একপক্ষ বলছে যে, না এটা কোনভাবেই সম্ভব না। তারা তাগুতদের অংশ। এটা শরঈ ভাবেও নিষেধ। আরেকপক্ষ বলছে যে, না! আপনারা বেশী কঠোরতা করছেন, শুধু অবিশ্বাস করছেন - এমন কিছু হবে না। বরং এই পথেই সাফল্য বেশী।

এমনকি বাংলাদেশে বিজয়ের পর অনেকেই বলাবলি করছে যে আল-জুলানীর মুভটা গুড ছিল, তিনি হিকমাতের পরিচয় দিয়েছেন বলেই বিজয়ী হয়েছেন - কিন্তু তারা নিজেরা আসলে কখনোই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর খপ্পড়ে পড়েন নি তো, না নিজেরা কখনো ময়দানে গিয়েছেন। ব্যর্থ হলে কিন্তু ঠিকই শুনতে হবে যে, এরা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর দালাল।

হুম, আল-জুলানী সাফল্য পেয়েছেন। কারণ অনেকগুলো সমীকরণ মিলে গিয়েছিল।

রাশিয়া ইউক্রেনে আটকে আছে, হিজবুল্লাহ জায়োনিষ্টদের সাথে আটকে আছে,বাশার বাহিনীও দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত। অন্যদিকে মুজাহিদরা এই সুযোগে ভরপুর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। বাশারের ভুল ছিল সে তুর্কির প্রস্তাবে রাজি হয়নি। আল-জুলানীর সব সিদ্ধান্ত ভুল এমন না।

কিন্তু তিনি ধরা। তার শরীয়াহ কায়েমের ইচ্ছা থাকলেও অনেক পক্ষকে খুশি করতে হবে। তুর্কিকে যেমন ঠান্ডা রাখতে হবে, আবার মাঠে থাকা ফরেন ফাইটারদের (বিদেশি যোদ্ধাদের) কথাও মাথায় রাখতে হবে। এরা কম বেশী আল-কায়দা পন্থীই। তার উপর আমেরিকা-জায়োনিষ্টদের বিষয়টাও মাথায় রাখতে হবে।

ইরান-রাশিয়া আপাতত হারলেও, ইরান এত সহজে ছেড়ে দিবে না। তাদের সাথেও কোন নেগোসিয়েশনে আসতে হবে, নয়ত তারাও প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা তো করবেই।

উম্মাহর মুনাফিক চেনা এবং উম্মাহ বিভক্তির একটি কারণ

সাহাবাদের মধ্যে ফিতনা হয়েছে না? আমরা আহলুস সুন্নাহ তা কিভাবে পাঠ করি? খুব সতর্কতার সাথে না? তাদের নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি কিংবা যুদ্ধ এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দরদ নিয়ে কথা বলি সতর্ক থাকি।

কিন্তু যাদের তাদের প্রতি কোন মায়া নেই, তারা এগুলো শুনে খুশি হয়। এবার বুঝি মুসলিমদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করা যাবে। যেমন ওরিয়েন্টালিস্টরা (প্রাচ্যবিদ)। একই ঘটনার বর্ণনা আমি দিবো, আবার ওরিয়েন্টলিস্টরাও দিবে। আমরটা পড়ে সাহাবীদের প্রতি আপনার ভালোবাসা জন্মাবে আর ওরিয়েন্টালিস্টদেরটা পড়ে তাদের প্রতি বিদ্বেষ।

আর ওদের লেখাগুলাই কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ইসলামিক স্টাডিজে পড়ানো হয়।

আলেমদের এই বিষয়টা খুব গুরুত্বের সাথে মাথায় রেখে তা বন্ধের চেষ্টা করতে হবে। নতুবা আমরা কিসের আহলুস সুন্নাহ হলাম?

মুসলিমরা শিয়াদের খপ্পড়ে, কিংবা তাদের তাকিয়া ধরতে পারে না কেনো? কারণ তারা আহলুস সুন্নাহকে ধারণ করতে পারেনি। এই জন্য সুন্নী ঘরে জন্মেও সে আসলে সাহাবীদের দেখতে পারে না - এবং শিয়াদের ওয়ার্ল্ড ভিউ, কন্সপাইরেসী থিওরীর ভক্ত হয়।

সাহাবীদের মত বিরোধের ব্যাপারে আমাদের এ্যাপ্রোচ আমরা মুজাহিদদের মত বিরোধের ব্যাপারে প্রয়োগ করতে পারি। দেখবেন কিছু লোক মুজাহিদদের বিভিন্ন মত বিরোধ, আলেমদের বিভিন্ন মত বিরোধ নিয়ে পোস্ট দেয়। তারা আরবী কিছু টেক্সট দেয়, কিন্তু সেগুলো আপনারা পড়তে পারেন না।

তারা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে সমালোচনা যতটুকু না একে অপরের প্রতি, তার চেয়ে বেশী রঙচঙ মাখিয়ে প্রকাশ করে। কারণ কোন শব্দের অনুবাদ কিভাবে করলেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মিলিট্যান্টের অর্থ জঙ্গি করা যায়, সশস্ত্র করা যায়, আবার ইরাহাবী, সন্ত্রাসীও করা যায়। বাক্যের গঠন ওই শব্দটাকে পজেটিভ বা নেগেটিভ আকারে প্রকাশ করবে।

অথবা যেমন আছে তেমনই প্রকাশ করলো, কিন্তু সে তো পারতো নরম ভাবে প্রকাশ করতে? কিন্তু না। সে চাচ্ছেই ওই ফিতনটা এখানে এনে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করতে। নিজেদের মত প্রমাণ করতে। অথবা শুধু মজা নিতে, উপহাস করতে।

তাদের আসলে উদ্বেগ নেই, অকৃত্রিম ভালোবাসাটা নেই উম্মাহর প্রতি। যেখানে তাদের কষ্ট পাওয়ার কথা ছিল যে, মতবিরোধ করে একে অপরের ক্ষতির কারণ হচ্ছে, সেখানে তারা যেন উল্টো আরো উল্লাসিত হচ্ছে।

যে, এই দেখো এদের অবস্থা। তাদের টেলিগ্রামে আরো গোপণ তথ্য দেয়া আছে, চলেন চ্যানেলে জয়েন দেন। এই কাজগুলো সাহাবাদের সময়ও কিছু লোক করতো। এরা ফিতনা বাঁধাতো আর লোকজন সেগুলোতে পড়তোও। এসবের জন্যই যুদ্ধ হয়েছিল। এখনো সেই সার্কেল চলছে। এজন্য বলি বেশী বেশী সীরাত আর সাহাবাদের চর্চা করেন, বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশিদা। তারপর বাকি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেন।

কারণ হিংসা, অহংকার আর অন্তরের আমাদের মত বিরোধদের সাথে ইনসাফ করতে শিখায় না। বরং নিজেদের ইগো পরিতৃপ্তি করার জন্য সকলেই, এমনকি খুব ইলম ওয়ালা, খুব রিজিড পার্সনদেরও কখনো কখনো দেখেছি এখানে এসে আটকে যাচ্ছে, পাল্টে যাচ্ছে। আমি নিজের ব্যাপারে বলি যে, গণতন্ত্রপন্থীদের আমি পছন্দ করি না।

কিন্তু আমি চেষ্টা করি নিজেকে মনে করিয়ে দেয়ার যে, তাদেরও অনেক কুরবানী আছে, তাদেরও অবদান আছে, তারাও উম্মাহর অংশ। তাদের সাথে ইলমি ফাইট হবে, হতে হবে। কিন্তু তাদের সাথে যতটুকু সম্ভব মিথ্যাচার কিংবা কাফিরদের সাথে মিলে তাদের ক্ষতি করা এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

কিছু লোক থেকে সতর্ক থাকবেন, যারা মামলা-হামলার ভয় দেখায়, যারা কাফিরদের সাথে হাত মিলিয়ে অন্য মুসলিমদদের বিরুদ্ধে কাজ করাকে সমর্থন করে। কারণ তারা পুরোপুরি স্বার্থপর। উম্মাহ তাদের কাছে কোন ইস্যু না। তাদের স্বার্থে লাগলে তারা আপনারে বেঁচে দিবে।

এমন লোকদের থেকে বেঁচে থাকবেন যারা, সালাফী কিন্তু নন সালাফীদের সাথে ঐক্য করবে না কিন্তু কাফিরদের সাথে ঐক্য করাকে সমর্থন করে।

আবার নন-সালাফী যারা সালাফীদের উঠতে বসতে ভুল ধরে, অথচ শিয়াদের জন্য তাদের বুক কান্নায় ভেসে যায়, সালাফীদের সাথে ঐক্য করবে না। কিন্তু শিয়াদের সাথে করতে রাজি। এই প্রকারের লোকগুলো আবার বিজয় আসার পর সবার আগে এমন ভাব ধরে যে, তারাই বিজয় এনেছে।

অথচ বিজয় আসার আগে যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হতো যে, বিজয়ী বাহিনীতে যোগদান করার জন্য হিজরত করা উচিত কিনা, তারা বলবে নাউযুবিল্লাহ, তুমি তো ব্রেইন ওয়াশ হয়ে গেছো। তোমাকে ফিতনায় যেতে কে বলেছে? এরা তো ফিতনাবাজ এজেন্ট।

আবার আপনি এজেন্সী, কারো দাবার গুটি হিসেবে কাজ করতে অস্বীকার করবেন, বলবে, আপনি নুব, বাস্তবতা বুঝেন না। আপনারা মাঠ নষ্ট করছেন। কিন্তু আপনি যদি এজেন্সীর গুটি হিসেবে কাজ করেন, তখন এরা আপনাকে ঠিকই দালাল বলবে। যতদিন না বিজয় আসবে। বিজয়ের পর বলবে, এটাই আসলে হিকমাহ ছিল।

দেখো যারা এজেন্সীর হেল্প ছাড়া ফাইট করতে চায়, অতিবিশুদ্ধবাদীরা দেখো, কিসে জয় আসে। তোমরা উম্মাহর কোন বিজয়টা আনসো? অথচ বিজয় না আসলে, তারা কিন্তু দাবার গুটি, এর ওর দালাল হিসেবেই ট্রিট পেত। তাদেরকে এভাবে কালারিং করা হতো।

আমি বলি যে, এসব লোকের কোন আদর্শ নেই। এদের বুক-পিঠ সমান। এদের মধ্যে কিছু আছে মাসালকি সংকীর্ণতার কারণে এরকম করে। আর কিছু আছে যারা আসলে উম্মাহর কালেক্টিভ বিজয় নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যাথাই নেই তেমন একটা। এদেরকে শয়তান সুরসুরি দেয়, তাই এরা এরকম করে বেড়ায়।

গ্লোবাল পলিটিক্সে আল-কায়দা এবং শাম-আফগানে অবদান

আফগানে আল-কায়দার বিজয়ী হবার একটা বড় কারণ ছিল, আল-কায়দা সিআইএ (CIA-Central Intelligence Agency)স্টেশনগুলা ধ্বংস করে দিয়েছিল। আল-কায়দা সব লড়াই লড়ে না, আল-কায়দা কিছু কিছু লড়াই লড়ে। এবং গুরুত্বপূর্ণ লড়াইগুলো লড়ে।

সিআইএ স্ট্রাকচারগুলা ধ্বংস করার কারণে, বারবার আমেরিকানদের তাদের সিকিউরিটি পলিসি চেইঞ্জ করতে হইসে। আগে যেখানে সহজে তারা মুভ করতে পারতো, সেখানে পরে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বিধা, অবিশ্বাস শুরু হইসে।

এজেন্সীর লোক যত অভিজ্ঞ হয় তত ভয়ংকর হয়, এবং পরের ব্যাচকে তার অভিজ্ঞতা শিখিয়ে যায়, চিনিয়ে যায়। আল-কায়দা এদেরকে শেষ করে দিচ্ছিল। এ কারণে আফগানের গেরিলাদের রিয়েল সিচুয়েচন নিয়ে আমেরিকা বারবারই ধোঁকা খেয়েছে।

তারা এ ধার্যকরণ ভুল করেছে। মাঝ খানে কি রিং রোড বানানোর প্ল্যান করেছিল আফগানের সম্পদ লুটপাট সহজ করতে, সেটাও করতে পারছিল

না। এত সেনা রেখে দেয়ার খরচ, দালালদের খরচ - তার উপর কয়দিন পর পর নতুন এজেন্টদের নিয়োগ যারা হঠাৎ মাঠে এসে তেমন একটা পারফর্মও করতে পারে না।

কিন্তু সিরিয়ার ক্ষেত্রে এমনটা হয়নি। তালিবানরা আল-কায়দাকে বিশ্বাস করেছিল। তালিবানরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা জানতো। তারা বুঝতো যে, আল-কায়দার অনেক মুহাজির যাদের মাসলাক আলাদা, আক্বীদা-মাযহাবে মতপার্থক্য আছে, কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা আছে।

তাদেরকে সেগুলো ব্যবহারে নিজেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। সিরিয়াতে যারা স্থানীয়, তাদের বিষয়টা এমন হয়ে গেসে যে, আমরা কি কম বুঝি? আমরাও টেকনোলজি বুঝি! কিন্তু তারা ওই যে এজেন্সির লোকদের মারতে পারেনি, উল্টা এজেন্সীর লোকেরা মুজাহিদদের মধ্যে গুপ্ত হত্যা করাতে পেরেছে।

যদিও সিরিয়াতে লাস্ট টেকনোলজির ব্যবহার অভূতপূর্ণ। এমনকি হামাসের চেয়েও ভালো। আল-কায়দাকেও শিখতে হবে এখান থেকে। তালিবানদেরও।

গতকাল আল-জুলানী তুর্কি ইন্টেলিজেন্সের হেডের প্রধানের সাথে একই গাড়িতে দেখা গিয়েছে। তুর্কির সাথে আল-জুলানীর মাখামাখি নিয়ে আল-কায়দা বরাবরই অসন্তুষ্ট। কিন্তু এদিকে এটাও কথিত যে, তারা আরো আগে অভিযান চালানোর চিন্তা করছিল, কিন্তু তুর্কি নিষেধ করছিল।

তুর্কির কথা ছিল বাশারকে পলিটিকালি স্টেপ ডাউন করতে বাধ্য করবে। কিন্তু পরে মুজাহিদরা এক প্রকার নিজ থেকেই এত দ্রুততার সাথে অভিযান চালায় যে, বাকি এ্যাক্টরদের আসলে তেমন করার কিছু ছিল না।

কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, তারাও বুঝতে পারছে যে, তারা অনেকটাই ওপেন। বরং আল-জুলানী নিজেই নিজেকে ওপেন করেছে যেন ট্রাস্ট অর্জন করা যায়। তার মাথার মূল্য সরানো যায়, তার পুনর্বাসন করা হয়। তুর্কি আর আমেরিকার কাছে আর কোন অপশনও ছিল না।

ভালো যতটুকু হয়েছে যে ৫০ বছরের নিষ্ঠুর দুঃশ্বাসন শেষ হয়েছে। সামগ্রীকভাবে মুসলিমদের এতে উপকার হবে। কিন্তু পলিটিক্স আর ইন্টেলিজেন্স মুসলিমরা আমেরিকাকে পরাজিত করতে না পারলে, এই বিপ্লবের ফল আমেরিকা হাইজাক করেনিয়ে যাবে।

অলরেডি তারা এমন একটা ন্যারেটিভ তৈরী করে ফেলেছে যে, তারাই জুলনীকে হিরো বানাচ্ছে। শিয়ারাও একমত। এ তো আমেরিকার দালাল। মুসলিমদের মধ্যেও অনেকে ধোঁকা খাবে, এ পথই বোধহয় মুক্তির পথ আমেরিকাকে শত্রু বানিয়ে কাজ না করা। তার এ্যাসেটগুলোর প্রতিরক্ষা করা। অথচ এটাই নিঃশর্ত শরীয়াহ কায়েমের মূল বাঁধা।

যেমন বাংলাদেশে পার্শ্ববর্তী দেশের হেজমনি (আধিপত্য) নিয়ে যতই কথা বলুন, এখানে আমেরিকা এ্যাসেট ইনটেক্ট থাকলে, তারা ওই পাশের দেশের ন্যারেটিভই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। আমেরিকার এনজিওগুলা যারা ডীপ স্টেট হয়ে বসে আছে।

যারা ইকোনমিক হিটম্যান ইউস করে কৃত্রিম ক্রাইসিস দেখিয়ে আমাদের ডলার লোনে ফেলছে, তেমনি একই কৌশলে পশ্চিমাদের নষ্ট-ভ্রষ্ট কালচার আমাদের দেশে ইনজেক্ট করছে, প্রাতিষ্ঠানিকরণ করছে। এই হেজমনি (আধিপত্য) (আধিপত্য) না ভাঙলে পাশের দেশের হেজমনি (আধিপত্য)ও ভাঙতে পারবেন না।

আল-কায়দার ক্রেডিট দিলে অনেকে চেতে যায়। আরে ভাই আমি প্রমাণ সহকারে ক্রেডিট দেই। আমেরিকার এসব কূটনামি নিয়ে আল-কায়দাই কথা বলে, আল-কায়দাই এটা প্রতিহতের কথা বলে। এজন্য গ্লোবাল জিহাদ এখনো প্রাসঙ্গিক।

কারণ তাদের ওয়ার্ল্ড অর্ডার রক্ষায় কাজ করলে, আমরা নিঃশর্ত শরীয়াহ কায়েম করতে পারবো না। আমাদের হাত-পা বাঁধা। আমি অন্যান্য মুসলিম দলগুলোরও ক্রেডিট দেই তাদের যার যার অবদানের জায়গা থেকে। আপনি আল-কায়দার সাথে দ্বিমত রাখতে পারেন, সমালোচনা করতে পারেন তাদের ট্যাকটিকস (কৌশল) নিয়ে।

কিন্তু এই যে বিষয়টা আমেরিকা আমাদের শরীয়াহ কায়েমে বাঁধা দেয়, জায়োনিষ্টদের সব রকম সমর্থন দেয় এটার সমাধান কি? সমাধান হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় তারা এ কাজগুলো করে সেগুলো ধ্বংস করে দেয়া। তাদের চোখ কানগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া। সাপের মাথাকে নষ্ট করে দেয়া। কঠিন হলেও এটাই দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের চাবিকাঠি।

পর্দা ও হিজাব সেক্যুলার এবং পশ্চিমা বিশ্বের চুলকানি

আল-জুলানীর সাথে এক মেয়ে ছবি তুলতে চাওয়া তিনি তাকে হুডির ঘোমটাটা দিয়ে নিতে বলেছিলেন এতে সেকুলররা সহ পুরো পশ্চিমা বিশ্ব ক্ষেপে গেছে। কারণ কয়েকদিন আগেই আল-জুলানী বললেন যে, তারা সিরিয়াতে নারীদের হিজাব করতে বাধ্য করবেন না। ঠিক যেমন বাংলাদেশের আমীরে জামাত বলেছিলেন যে, তারা নারীদের হিজাব করতে বাধ্য করবে না। এবং এরপর তাকে অনেক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়।

হিজাব পালনে বাধ্য করা কি শরীয়াহ কায়েমের অংশ? কিংবা বাধ্য করা আসলে কি বুঝায়? না করলে সেটার শাস্তি আসলে ইসলামে কি?

ইসলামে আসলে কোন মেয়ে পর্দা না করলে তাকে সুস্পষ্টভাবে কোন শাস্তির কথা বলা নেই। কিন্তু হুকুমত চাইলে তাজির[17] হিসেবে কোন শাস্তি দিতে পারে। না দিলে তারা শরীয়াহ কায়েম করতেসে না, বিষয়টা এমন না। বাধ্য করা বা শাস্তি দেয়াই একামাত্র মেকানিসম না, আরো মেকানিসম থাকতে পারে, এবং আছে।

হুকুমতের কাজ হলো ব্যবস্থাপনা। তারা এমন একটা পরিবেশ তৈরী করবে, সেখান পর্দা করার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়। তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের জন্য নির্দেশ করবে।

ইসলামের ফরজ বিধানগুলোর জন্য মানুষদের আম আদেশ দিবে কিন্তু ঘরে ঘরে গিয়ে কে কতটুকু ইসলাম পালন করছে সেটা দেখা হুকুমতের জন্য সম্ভব নয়। হুকুমত নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, এবং হুদুদের জন্য আদালত এবং তামকীন সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

হিজাব থেকে শুরু করে অন্যান্য আরো কিছু বিষয় হুকুমত থেকে টপ ডাউন এ্যাপ্রোচে না, বরং বটম আপ এ্যাপ্রোচে সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সমাজ এমন ভাবে কার্যক্রম করবে যে, মানুষরা স্বাভাবিক পর্দা ছাড়বে না। পরকিয়া, ব্যাভিচার করবে না। এই রকম এক্সট্রিম কেইসগুলোতে হুকুমত শাস্তির জন্য আদালতের শরণাপন্ন হবে।

তবে পরিস্থিতি যদি এমন হয়, হুকুমত সমাজের মানুষের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি রোধে তাজির হিসেবে কোন শাস্তি নির্ধারণ করে, সেটাকে আপনারা কঠোর বলতে পারেন, কিন্তু সেটা শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অন্যথায় হুকুমত নমনীয়ও হতে পারে। হুকুমত শুধু হারাম কাজ হয় এরকম প্রতিষ্ঠান, সম্ভাবনাগুলো আটকে দেবে।

---

[17] তাজির এর হুকুম (fatwaa.org)- https://tinyurl.com/2s43j7yf

যেমন মাহরাম ছাড়া দূরে যাওয়া, অবস্থান করা, কিংবা নর-নারী একাকী হবার সুযোগ রাখা, ফ্রি-মিক্সিং যেমন চিন্তা করা যায় অনেক সময় ধরে নন-মাহরামদের সাথে নিয়মিত উঠবস করা ইত্যাদি।

এরকম প্রতিষ্ঠান তারা গড়তে দিবে না। তাহলে পর্দার ইল্লতটা প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামী-স্ত্রী নিজের প্রতি যে সন্দেহর দৃষ্টি, সেটা বিসর্জন দিতে হবে না। দাম্পত্যে কলহ কমবে, ব্যাভিচার-পরকিয়াও কমবে।

যেমন তালিবানদের পর্দা না করলে এই এই শাস্তি ঘোষণা করতে হয়নি। তালিবানরা হুকুমতে আছে মানে, অধিকাংশ মেয়েই ধরে নিবে যে, পর্দা ছাড়া বের হওয়া উচিত হবে না।

আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, এই তর্কেই যাওয়া উচিত নয় যে, পর্দা করতে আমরা বাধ্য করবো কিনা। উমার (রা.) এর ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি যেভাবে খিলাফত চালিয়েছেন, অন্য কেউ এভাবে চালালে মানুষ বিদ্রোহ করতো। কিন্তু তার মর্যাদা-ওয়েট এমন ছিল যে, মানুষ বিষয়টা মেনে নিয়েছে। প্রশ্ন করেনি এটা এমন কেনো? অমন কেনো? খুব একটা।

কিন্তু ইরানে দেখেন, তারা ফ্রি-মিক্সিং এরও সুযোগ দিচ্ছে, আবার পর্দা না করলে শাস্তির বিধানও রেখেছে।

এ কারণে এ নিয়ে বিদ্রোহ বেশী করার সুযোগ তৈরী হচ্ছে কারণ ফ্রি মিক্সিং ১০০% অফ না করতে পারলেও, একটা নূন্যতম সীমা পর্যন্ত অফ করার কাজ হুকুমতকে করতেই হবে। আমাদের পর্দা করার অবস্থান তৈরী করতে হবে। হুকুমত এই কাজটা করবে সমাজিক শক্তির সাহায্যে। কমিউনিটি পর্দা কায়েম করবে। হুকুমত এক্সট্রিম কেইসগুলো দেখবে।

এখন কেউ যদি বিদ্রোহী হয়, শত্রুদের গোলাম হয়, উসকানী আর ফিতনা করার জন্য পর্দা না করে, অন্যদের নিষেধ করে।

তাদেরকে জরিমানা দিয়ে, পর্দা না করার কারণে শাস্তি দিয়ে আটকানো যাবে না। তাদের সমস্যা তো ঈমানে, তারা তো নিফাকে আছে। তাদের অন্যভাবে খেলে দিতে হবে। এখানে জোর-জবরদস্তির কিছু নেই।

সিরিয়া বিজয়ের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেদিকে উঁকি দিচ্ছে

সাংবাদিক বিলাল আব্দুল করীম বলেন যে, সিরিয়ার জনগণ আসলে যেটা চায় সেটা হলো আদল, ন্যায়বিচার। যদি এমন হয় যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে প্রশাসন তিন বেলার জায়গায় দুই বেলার খাবার ব্যবস্থা করতে পারছে, জনগণকে বুঝিয়ে বললে তারা সেটা মেনে নিবে। যেটা মেনে নিবে না, সেটা হচ্ছে অবিচার। ইনক্লুসিভ, গণতান্ত্র, নির্বাচন এসব নিয়ে আসলে জনগনের মাথা ব্যাথা নেই।

আমি এই কথাটা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য মনে করি। শুধু বাংলাদেশই নয়, সব জায়গার জনগণের কমন বিষয় হবে এটা। কিন্তু পশ্চিমারা এখানে ইনক্লুসিভ,গণতন্ত্র এরকম বিভিন্ন বিষয় চাপিয়ে দেয়। এগুলো জনগণকে খুশি করার জন্য না। এগুলো পশ্চিমাদের খুশি করার জন্য। পশ্চিমারা এইরকম ইস্যুগুলো দিয়ে আপনাকে চেকে রাখবে। ভুল ধরবে। শিখাতে আসবে। আপনার রাহবার, শিক্ষক সাজবে। তাদের বিভিন্ন এনজিও-গুলোকে দেশে অপারেট করার জন্য ফ্রি প্যাসেজ চাইবে।

বর্তমান ইউনুস সরকার তো এনজিও সরকার, সে আমেরিকার আস্থা ভাজন। কিন্তু জনগণ তাকে মেনে নিয়েছে, ন্যায়বিচারের আশায়-ইনসাফের আশায়। সে কার দালাল সেটা দেখার বিষয় না। তারা এত মারপ্যাঁচ বুঝে না কিভাবে এনজিও গুলোর মাধ্যমে আমেরিকা এদেশকে তাদের একটা ল্যাব বানিয়ে রেখেছে, এবং তাদের ডলারগুলো ঋণ হিসেবে দিয়ে সেটাতে এদেশের মানুষের শ্রমের মূল্য এ্যসাইন করে, সেটাকে শুধু

কাগজের টুকরা, অথবা কিছু ডিজিটের বিপরীতে সত্যিকারের মূল্যবান কিছুতে পরিণত করছে। জনগণ আসলেই সেটা বুঝে না। তারা বুঝে, তাদের সংসার ঠিকমত চললো কিনা।

আসিফ নজরুলদের ব্যাপারে জনগণ নাখোশ হচ্ছে কারণ স্পষ্টতই সে এবং বাকিরা উপদেষ্টা প্যানেলে শুধুমাত্র একটা ঘরাণার তথা প্রথামালোর ভাই-ব্রাদারদেরই নিয়োগ দিয়েছে, ৩-৪ জন বাদে, সব তাদের ঘরের লোকজন। এই যে সুস্পষ্ট বৈষম্য এটা কিন্তু সাধারণ জনগণ বুঝে না। যারা বুঝে তারা জনগণকে বুঝালে তারপর জনগণ বুঝে।

এই যে বুঝানোর সময়টার মধ্যে তারা যতটুকু পারেনিজের কাজের কাজ করতে থাকবে। প্রশাসনিক সুবিধা নিয়ে নিজেদের ব্যবসা, নিজেদের অন্যান্য সব দুর্নীতি এসব আরামসে করে যাবে। এজন্য পশ্চিমারাও কিছু বলবে না। কারণ এটা তাদের কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট (স্বার্থের দ্বন্দ্ব) না।

আল্লাহর শরীয়াতে যেমন হুদুদ আছে, পশ্চিমাদের শরীয়াতেও তেমন হুদুদ আছে। হুদুদ মানে সীমা। অন্তত এতটুকু মানতেই হবে। যেমন আন্তর্জাতিক বর্ডার স্বীকৃতি দিতেই হবে। না করলে চুক্তি লঙ্ঘনের দায়ে আপনার দেশের উপর তারা বম্বিং করবে, স্যাংশন দিবে, অথচ একই কাজ জায়োনিষ্টরা করলে তারা চুপ করে থাকবে, উল্টো তাদের আরো বেশী অর্থ, গোলা-বারূদ সাপ্লাই দিবে।

তারা সিরিয়াতেও একই কাজই করতে চায় কিংবা করছে। তারা সিরিয়াকে টুকরো টকরো করতে চায়। প্রথম প্ল্যান ছিল যে ইউফ্রেটিস নদীর (ফুরাত নদী) উত্তর অংশটা কুর্দীদের স্বায়ত্ত্ব শাসন দিবে। অথচ সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে সিরিয়ান আরবরাই। আবার কুর্দি যারা আছে, তারা কুর্দি মার্কিনিষ্টদের সাপোর্ট করে না।

অথচ আমেরিকা এদের ক্ষমতা দিতে চাচ্ছে। তুর্কি এর পক্ষে না। মুজাহিদদের সামনেও এরা টিকতে পারবে না। সিরিয়াতে আরেকটা জাতি আছে, নাম দ্রুয।

তারা ইসমাইলি শিয়াদের থেকে বের হয়ে যাওয়া একটি দল এবং নিজেদের মুসলিমও দাবী করে না। জায়োনিষ্টরা গোলান মালভূমি যতটুকু দখল করে সিরিয়ার আরো যে কয়টি গ্রাম দখল করেছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে দ্রুযদের।

দামস্কাসের দক্ষিণ থেকে গোলান পর্যন্ত ওই দ্রুযদের বসবাস। কিছু কথা শোনা যাচ্ছে বা শোনানো হচ্ছে যে, দ্রুযরা সিরিয়ার নতুন ক্ষমতাসীনদের সাথে থাকতে সেইফ ফিল করতেসে না। তাহলে তাদের কি হবে? সোজা কথা তারা জায়োনিষ্টদের অবৈধ রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ জায়োনিষ্টরা এই অংশটুকু দখল করার জন্য একটা উসিলা খুঁজে পেলো।

অর্থাৎ জায়োনিষ্ট আমেরিকার কাছে এক হচ্ছে কুর্দি কার্ড, আরেক হচ্ছে দ্রুয কার্ড। কুর্দি কার্ডে সুন্নীদের জয় হওয়াটা সহজ হলেও, দ্রুয কার্ডে মনে হয় না যে, তারা জায়োনিষ্ট আমেরিকার সাথে আপোষ না করে থাকতে পারবে। কারণ এমনিতেই এরদোগান তারপর ইখওয়ানপন্থীদের কাছে সেক্যুলার গণতন্ত্র বাদ দিলাম।

নির্বাচান এবং এর জন্য একাধিক রাজনৈতিক দল তেমন ইস্যু না তারা এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। যদিও একটা দেশের এরকম বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে আমেরিকা প্রতিযোগিতা করায় যে কারা কত বেশী আমেরিকান লবি ইউস করে সেই দেশটাকে এক্সপ্লয়েট হবার সুযোগ দিবে। অর্থাৎ আপনি নিজেই নিজের গলায় একটা শিকল বেঁধে তাদের হাতে দিচ্ছেন।

যদি ইসলামী ইমারত সিরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে আবারো হয় একনায়কতন্ত্র হবে, এবং এরপর আবারো বিপ্লব হবে। তা না হলে আবারও দুর্বল গণতন্ত্র হবে। লসটা যা হবার হবে জনগণের।

মুজাহিদদের তেমন লস নেই। তাদের বের করে দিলেও তারা ঠিকই নতুন ফ্রন্ট খুঁজে পাবে, যেমনটা আগেও পেয়েছিল। কারণ মুজাহিদ গ্রুপ দেশের ভিতরে রাখাও জায়োনিষ্ট আমেরিকার পছন্দ না। এ বিষয়গুলো জনগণকে বুঝতে হবে। ইসলাম এবং ইসলামের মুজাহিদরা থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দিয়ে জনগণকে রহমত-বরকত দিবেন।

নতুবা গণতন্ত্র আমেরিকার হাতে নিজেদের সপে দিলে আল্লাহ তা'আলা তাদের হাতে ছেড়ে দিবেন। তারপর দেখেন দুনিয়াতে কেমন আরামে থাকেন, আর আখিরাতেও। হয়ত দুনিয়াতে আপাত দৃষ্টিতে আরামে থাকবেন, অনেক অর্থনৈতিক উন্নতিও হতে পারে। কিন্তু দেখবেন ব্যাভিচার, কলহ, অর্থে বরকত কম, প্রজন্ম সেক্যুলার মুলহিদ হয়ে যাচ্ছে। মানসিক শান্তিতে জীবনেও থাকতে পারবেন না।

যেমন আমাদের দেশে তো ইসলাম, মুজাহিদ কোনটাই নেই। একটু তাওহীদের পতাকা উড়ালেও কাফিররা রাগ করবে এ জন্য নিষেধ করা হয়, কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোতে কি এজন্য শান্তি আছে? আমরা কি অর্থনীতিতে উন্নতি করে উল্টিয়ে ফেলেছি? আমাদের রাস্তাঘাট, দালান কোঠা গুলো কি অনেক উন্নত? এমনকি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকেও?

তাহলে তারা আসলে কিসের ভয় দেখায়? কিসের স্থিতিশীলতার গান শুনায়? যারা শুনায় তারা কেবল তাদের ব্যক্তিগত সুবিধাজনক স্থান নিশ্চিত হয় এই সাপেক্ষে আপনাকে হাইকোর্ট দেখায়। নতুবা তাদের আসলে উম্মাহ নিয়ে, দ্বীনের বিজয় নিয়ে কোনো রকমের রিয়েল কনসার্নই নেই।

ইখওয়ানুল মুসলিমীন এবং জামা'তে ইসলাম

ইখওয়ানুল মুসলিমীনের (ব্রাদারহুড) একটা প্রকল্পের বিষয়ে আমরা সকলেই কম বেশী জানি, যেটা উপমহাদেশে জামা'তে ইসলামীও ফলো করার চেষ্টা করে, সেটা হলো বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিজেদের লোক ঢুকানো - পাশাপাশি নিজেদের ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক তৈরী করা। যে ব্যবসার লভ্যাংশগুলো সংগঠনের কাজে লাগবে।

এগুলোর ভিত্তি আমরা সংগঠনকে তিনটা লেয়ারে ভাগ করতে পারি।

১। সামরিক অংশ

২। রাজনৈতিক অংশ

৩। ব্যবসায়িক অংশ

৮০'র দশকে সিরিয়ার জিহাদের সামরিক অংশের সাথে রাজনৈতিক অংশ বোঝাপাড়ায় ঘাটতি দেখা যাচ্ছিল, কারণ রাজনৈতিক অংশটা অনেক সময়ই সামরিক অংশকে ধ্বংস করেনিজেদের কূটনৈতিক লাভ-ক্ষতির হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিত। যেহেতু সামরিক অংশটাও রাজনৈতিক অংশের মুখাপেক্ষী, তাই সামরিক অংশটা রাজনৈতিক অংশটির সিদ্ধান্ত ব্যতীত মুভমেন্ট করতে পারতো না।

দেখা যেত যে সামরিক অংশটি অনেক কষ্ট করে জীবন-যাপন করছে। তাদের স্পিরিটটা বেশী, আপোষকামিতা কম। অন্যদিকে রাজনৈতিক অংশটি একটা কমফোর্ট জোনে, অথবা প্রবাসে থেকে পরিচালিত হচ্ছে। এতে তাদের মধ্যে বিলাসিতা, আপোষকামীতা এবং বিপ্লবী মনোভাবে প্রচন্ডরকমে ঘাটতি দেখা দেয়া শুরু করে। এবং তারা সামরিক অংশের কুরবানীটাকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারে না।

পরবর্তীতে তো সামরিক অংশগুলো ধীরে ধীরে নাই হয়ে যেতে লাগলো। যেমন উপমহাদেশের জামাতের কথা চিন্তা করা যাক। সংগঠনের একটা বোঝাপাড়া ছিল যে, কিছু ব্যবসায়িক, এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠা - অন্য সব স্বাভাবিক ব্যবসার মতই ব্যবসা করবে। ব্যবসায়িকদের বিপ্লবী এবং খুবই আদর্শবাদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। মৌলিক ঈমান-আমলের সাথে তারা ব্যবসা করবে, ব্যবসা বাড়াবে। সংগঠনকে লাভ দিবে। ইনফ্লুয়েনশিয়ালও হবে।

কিন্তু দেখা গেলো যে, এই ব্যবসায়ীরা অনেক বেশী পাওয়ারফুল হয়ে গেল ধীরে ধীরে। সংগঠনের নেতাদের চাইতে, ব্যবসায়িরা বড় বড় সুপার স্টার। তাদের সম্মান বেশী। এতে হলো কি যে, পরবর্তীতে সংগঠনের নেতৃত্ব এই ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসায়িরা বিপ্লবী হতে পারে না সেই অর্থে। তাদের পিছুটান থাকে।

তারা রাজনীতিতে না রিস্ক নিতে পারে, না বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। তারা চিন্তা তার ব্যবসা ঘিরে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঠিক-ঠাক রেখে তারা বাকি রাজনীতিতে যা করা যায়। তাই তারা বিপ্লবের পক্ষে না, সংস্কারের পক্ষে থাকে।

আপনি বর্তমান জামাতে ইসলামীর নেতৃত্ব দেখুন, প্রায় প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী। কেউ বিপ্লবী না সায়্যিদ কুতুবের মত। তারা সেই অল আউট গেইমটা খেলতে পারবে না। আদর্শিক রাজনীতি চাইলেও করতে পারবে না। সিস্টেমে ঢুকে সিস্টেম চেইঞ্জ করার বিষয়টা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আটকে যাবে। কারণ তখন তার এটা টিকিয়ে রাখাটাই বড় বিপ্লব হয়ে যাবে।

কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দরকার আছে। ব্যবসা চলবে ব্যবসার মত। কিন্তু তারা নেতৃত্বে আসবে না। বরং তারা সংগঠনের সাথে সম্পর্কও প্রকাশ করবে না যেন সেক্যুলারদের কাছে তা কোন রকমের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়। যথা সম্ভব বিষয়টা লো-প্রোফাইল রাখতে হবে। জামাত নিজেও এই

দাওয়াহ করে। এতটাই করে যে, তারা বলে দাড়-টুপি বাদ দাও, ইংলিশ বাবু ছাড়ো। হৃদয়ে ইসলাম রাখো। এরকম স্মার্ট ইসলাম দেখলে মানুষজন ভাববে, আরে ইসলাম তো ক্ষ্যাত না, ইসলামও আধুনিক।

কিন্তু তারা যেটা ভুলে যায়, তা হলো বিজয়ী মাত্রই স্মার্ট। আর পরাজিত মাত্রই ক্ষ্যাত। যেমন জুলানী বিজয়ী হবার পর, সবাই তার পদক্ষেপে স্মার্টনেস খুঁজে পাচ্ছে। এরদোগানের সাফল্যের কারণেও সকলের কথা, এটাই তো স্মার্টনেস। তালিবানদের বিজয়ের পর তাদের মত পাগড়ি পরার হিড়িক পরে গেছে দিকে দিকে। অথচ এদিকে কত ইন্টালেকচুয়াল (বুদ্ধিGBগিরি) মারানীরা কত কিছু স্মার্ট এলিট সেজে বসে আছে। কিন্তু পরাজিত তাই মানুষজন থুথু দেয়। অবস্থা এরকম যে, “গালি কা কুত্তা না ইধার কা, না উধার কা।”

আমেরিকান ডলার এবং এনজিও গুলোর অপ-তৎপরতা

বাংলাদেশের কোর্ট সব সময়ই বায়াসড। একে তো তাগুতদের বিধান আইন। তার উপর এক একজন বিচারককে যদি আপনি বাস্তবে দেখেন, ওআল্লাহি এদের বিবেচনাবোধ খুব নিম্ন মানের, এবং নির্বোধ টাইপের লোকজন।

তাছাড়া এন্টি টেরোরিজম ট্রাইবুনালে মজিব নামের যে লোকটা ছিল, সে তো পুরাই আমেরিকান এজেন্ট। তাকে স্পেশালি ট্রেইনিং দেয়া হয়েছিল।

এবং এই যে গুম-খুন দেখেন এগুলো সব আমেরিকান সিস্টেম। তারা নিজেদের হেজমনি (আধিপত্য) টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলিম বিশ্বে এরকম তাগুতদের টিকিয়ে রাখে যারা একচুয়ালি (প্রকৃতপক্ষে) তাদের পুতুল হিসেবে কাজ করে। তারা কখনো রাশিয়া বা চীনের প্রতি বেশী নতজানু হলে, তখন কেবল আমেরিকা তাদের সরিয়ে দেয়ার চিন্তা করে।

লীগ যেটা করেছিল যে, তারা আমেরিকান সিস্টেমের অপব্যবহার করছিল। আমেরিকা বলছিলো যে, তোমার এগুলা শুধু আমেরিকা বিরোধিদের উপর প্রয়োগ করো। গণতন্ত্র সাপোর্ট করে, এরকম মডারেট গ্রুপদের উপর করো না নতুবা চরমপন্থী বাড়বে। কিন্তু লীগ আর 'র' মিলে নিজেদের প্রতিপক্ষের উপর সেই টেকনিকগুলো ব্যবহার করছিল।

সশস্ত্র কোন গ্রুপ ক্ষমতায় আসলে যে রকম তামকীন থাকে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গেলে সেই রকম তামকীন কোন গ্রুপ কখনোই পাবে না। এবং তখন আমেরিকার জন্য সহজ হয় সেই গ্রুপগুলোকে নজরে রাখা। এবং দরকষাকষি টেবিলে সেই গ্রুপগুলো আমেরিকা থেকে কিছু আদায় করতে পারে না। বরং তাদেরকে টিকে থাকতে হলে নিজেদের অনেক স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। নতুবা আমেরিকা বিভিন্ন বিপদের ফেলায় ভয় দেখায় এবং বিপদে ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ মিশরে ড মুহাম্মাদ মুরসী (রহ.) এর কথাই চিন্তা করুন।

ইখওয়ান পশ্চিমা বিশ্ব শান্ত রাখার জন্য নিজেদের নিরস্ত্র করে ফেলেছিল যেন ওয়েস্ট তথা পশ্চিমারা তাদের বিশ্বাস করে, তাদের ক্ষতি না করে। এমনকি তারা সশস্ত্র গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিয়েছিল। কিন্তু এদিকে জায়োনিষ্টরা আশংকা করছিল যে, লং রানে এরা টিকে গেলে তাদের জন্য সমস্যা।

তারা আমেরিকাকে চাপ দিলো। আর এদিকে আমেরিকান পাপেট আরবরাও ক্যাম্পেইন চালালো। সেক্যুলাররা ক্যু করল, গণহত্যা চালালো ইখওয়ানের উপর,ইখওয়ানের কিছুই করার থাকলো না।

এদিকে তালিবানদের উদাহরণ দেখতে পারেন যে, সশস্ত্র থাকার কারণে বিপ্লবের পর আমেরিকা মাঠে তেমন কিছু করতে পারেনি। তাদের চাপ প্রয়োগ করার সিস্টেমটা সেখানে ভেঙে গেছে। একে তো তারা নিজেরা এসে পরাজিত হয়েছে তাই সামনে সে আবারো এরকম ম্যাস স্কেলে অভিযান চালানোর কথা সহজে ভাববে না।

সহজে আফগান দখল করার পর সে ভেবেছিল, আরে এত সহজ!! সেই খুশিতে তারা তখনই ইরাকেও চলে গিয়েছিলে মিথ্যা একটা ছুঁতো তুলে।

এটা মনে রাখবেন যে, সম্মুখ সমরে আপনি যদি না জিতেন, অর্থাৎ আপনি হারতেছেন। আর গেরিলা পদ্ধতিতে, আপনি যদি না হারেন, তাহলে আপনি জিততেছেন। আমেরিকা ইরাক-আফগান যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে গেলেও, অনেক ঋণের চাপে পড়লেও তারা এখনো টিকে আছে বিশ্বব্যাপী তাদের ডলার সিস্টেমের হেজমনি (আধিপত্য) থাকার কারণে। আর এটা তাদের টিকিয়ে রাখছে।

১। পেট্রো ডলার পদ্ধতি।

২। ইকোনমিক হিটম্যান পদ্ধতি।

আরো পদ্ধতি যেমন মুক্ত বাজার অর্থনীতি, মিলিটারি কমপ্লেক্স এসব থেকেও তারা আয় করে, হেজমনি (আধিপত্য) টিকিয়ে রাখার চেষ্ট করে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে মোটামুটি।

পেট্রো ডলার সিস্টেমের কথাও অনেকে জানে, কিন্তু এনজিওদের দিয়ে কিভাবে শোষণ এবং শাসন করছে, এটা আমরা আসলে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারি না।

পেট্রো ডলার পদ্ধতিটা আপনি জানেন যে, আরব থেকে তেল কিনতে হলে ডলারেই কিনতে হবে। এজন্য সবার ডলারের একটা চাহিদা থাকে। আর আমেরিকা ডলারকে পণ্যের মত বিক্রি করেছে ঠিক সেভাবে, যেভাবে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ সেল করে।

শুধু সফটওয়ারটা কপি করে বিক্রি করে। ডলারটাও এমন যে, তারা জাস্ট ছাপায় - আর পাঠিয়ে দেয়। যদিও সৌদি বলেছে যে, তারা এখন থেকে ডলার না, অন্য পদ্ধতিতেও বিক্রি করা শুরু করবে। তবুও এখন ডলারে তেল কিনার চল, চালু আছে।

ইকোনমিক হিটম্যান হলো খাস বাংলায় দালাল। এইসব দালালরা বিভিন্ন এনজিওই সুরাতে বিভিন্ন দেশে যায় - এবং সরকারগুলোকে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, দেখেন আপনাদের এটা লাগবে সেটা লাগবে। মেয়েদের প্যাড লাগবে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা লাগবে।

এই পদ্ধতিতে তারা এলজিটিভি (LGBTQ), সহ আর যত নোংরা জিনিস আছে, তা উপস্থাপন করে। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন অবকাঠামোগত প্রোজেক্ট আছে সেগুলোর প্রস্তাবনা দেয়।

সরকারের কাছে তো লোকবল টেকনোলজি কিছুই নেই। তখন তারা সরকারকে বলে, আমরা বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ (IMF) থেকে লোন এনে দিচ্ছি, শর্ত হলো কাজটা আমাদেরকেই দিতে হবে।

লোন আনার পর, ডলারগুলো এনজিও গুলো-কে দিয়ে দেয়া হয়। সেই ডলার খরচ করে, তারা রিসার্চ করে। আমাদের মধ্যে তাদের চিন্তাধারা থেকে শুরু করে, বিভিন্ন রিসার্চ প্রয়োগ করে, সোজা কথা আমরা তাদের ল্যাব।

যত খরচ হচ্ছে সেইগুলো ঋণ হিসেবে আমাদের রাষ্ট্রের নামে তথা আমাদের নামেই লেখা হচ্ছে। একে তো আমরা ঋণের ডলার আমেরিকান এনজিওকে বেতন হিসেবে দিচ্ছি, তারা আমাদের জন্য কাজ করার নামে নিজেদের রিসার্চ এর কাজ করছে, তাদের বিকৃতি চিন্তাধারা পুশ করছে, অপরদিকে সেই ঋণের ডলার আবার সুদে আসলে আমেরিকাকে ফেরত দেয়ার জন্য জমাও হচ্ছে।

ধরুন আমেরিকা একশ ডলার ছাপালো। যেটার কোন ভ্যালু নাই। জাস্ট কাগজ অ্যাটাকে বলে ফিয়াট কারেন্সী। কোন সম্পদের বিপরীতে তা ছাপানো হয়নি। সেটা আমরা ঋণ হিসেবে আনলাম। তারপর সেই ডলার আমরা এনজিওকে তথা আমেরিকাকে দিলাম যেন, তারা আমাদের আমেরিকানদের মত সভ্য বানাতে পারে, আমাদের উপর বিভিন্ন ওষুধ, টিকা ইত্যাদি প্রয়োগ করে। ভালো করে বুঝুন। আপনার হাতে কত ডলার

আছে? শূণ্য! কারণ আপনি যেটা এনেছেন, সেটা আবার বেতন হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন। আমেরিকা যেটা ছাপালো সেটা আবার এনজিও হিসেবে ফেরত নিয়ে আসলো।

তারা বলতে পারে যে, তারা শ্রম দিয়ে সেটা ফেরত এনেছে, ভালো কথা। কিন্তু সেটা শ্রম না সেটা তাদের রিসার্চ (গবেষণা) এর কাজ। তারা তাদের হেজমনি (আধিপত্য) চলমান রাখার জন্য এমন করছে, যেটা করতে তাদের খরচ করার কথা ছিল। উল্টো তারা সেটা দিয়ে কামাই করছে। শুধু কামাই না তারা সেটাকে আমাদের নামে ঋণ হিসেবে লিখিয়ে নিচ্ছে।

এখন আপনার কাছে আছে শূণ্য ডলার। আবার আপনার ঋণ ১০০ ডলার। মানে -১০০ তে আছেন। যেটা প্রতি বছর ধরুন ৪-১০% সুদের বাড়ে চক্রবৃদ্ধিতে। এখন শুরুতে আমেরিকা কিন্তু শূণ্য থেকে ডলার জাস্ট ছপালো, তখন সেটার কোন ভ্যালু ছিল না।

কিন্তু যখনই তা আমরা ঋণ হিসেবে দেশে আনলাম সেটাতে ভ্যালু এ্যাসাইন হলো, এই ভাবে যে, আমরা আমাদের শ্রম, সম্পদ সেটার বিপরীতে দিচ্ছি। যেমন যে এনজিও বেতন হিসেবে নিলো, তারা সেটা ইউস করে কেনা-কাটা করতে পারছে। আবার আমরা যখন ঋণ ফেরত দিবো - তখনও সেটা আমাদের শ্রম, অর্জন, প্রোডাকশন ফেরত দিচ্ছি।

তো ডলার অনেক জমা হয়ে যাবার পর, আমেরিকার কিছু মেকানসিম আছে যে, এক্সট্রা ডলার যেন ছাপানো না লাগে, তারা আপনাকে একটা বন্ড ধরুন ১ কোটি ডলার আপনার কাছে পায়, সেটা বন্ডে এসাইন করে ডলারগুলো নিয়ে আবার রিসাইকেল করবে। কারণ বেশী ডলার ছাপালে, চায়না একবার চেষ্ট করছিল যে, বেশী বেশী ডলার সিস্টেম করে আমেরিকাতে পাঠাতে। এতে আমেরিকার ভিতর ডলারের পরিমাণ বেড়ে গেলে তাদের দেশের মধ্যে মুদ্রাস্ফিতি দেখা দিবে। আমেরিকা চেষ্টা করে যত বেশী সম্ভব ডলার বাহিরে রাখতে।

আমেরিকা চেষ্টা করে প্রতিটা দেশে এই সিস্টেমটা চালু রাখতে যেন, তাদের অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক যোগান চলমান থাকে। তারা কখনোই গরীব হবে না, অর্থের সংকটে পড়বে না যতদিন না এই জিনিসটা চলমান থাকবে। আর না তাদের হেজমনি (আধিপত্য) ভাঙবে। বরং তারা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ইত্যাদি ফাঁকা বুলি দিয়ে আমাদের মধ্যে ছড়ি ঘুরাবে, এবং আমাদের স্বাধীন মতে কোন সিস্টেম চালু করতে দিবে না।

বাংলাদেশে যেই সরকারই আসুক, আমেরিকান এনজিও গুলোকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েই আসতে হচ্ছে। সেক্যুলারদের কাছে এসব সমস্যা না। বরং তারা নিজেরাই তো এসব এনজিওর প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে নব্য উপনিবেশবাদ। আমি-আপনি বিরোধীতা করলে আমাদেরই রাষ্ট্রদ্রোহী বানিয়ে দিবে। আফগানে সীমিত পর্যায়ে এদের এ্যাক্টিভিটি আছে। ১০০% মুক্ত না তারা। যত বেশী হবে, তত আফগানর আবার আমেরিকান হেজমনি (আধিপত্য)র ভিতর চলে যাবে।

সিরিয়ার কথা বলতে গেলে, আমেরিকার একটা বড় গোপণ স্বার্থ হচ্ছে, এনজিও গুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়ার ক্ষেত্রে সিরিয়ার নেতৃত্বকে রাজি করানো। এবং তারা সেই শর্ত দিবে। বলবে তোমাদের লোন দিয়ে যত বাড়িঘর ধ্বংস হইসে সব বানিয়ে দিবো। স্বাস্থ্যখাত, শিক্ষাখাতে খরচ করবো, মানে ঋণ দিবো ফ্রিতে তারা দেয় না। খবর শুনে আপনাদের মনে হতে পারে, আরে কত দিল দরিয়া জাতিসংঘ। অথচ বেশীরভাগই ঋণ। এগুলো সুদের আসলে ফেরত দিতে হবে।

আবার দিবেও এই শর্তে যে, তাদের কারিকুলাম পড়াতে হবে। যেমন এখন জাতিসংঘ সিরিয়ার সংবিধান লেখার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। এভাবে তারা সরকার এবং বিচার ব্যবস্থায় হাত দিবে। তাদের মনমতো তখন আইন পাশ হবে। তারা খসড়া লিখে দিবে। এমপিরা জাস্ট পার্লামেন্টে পড়ে সেটা কায়েম করে ফেলবে। আর বলা হবে এটাই গণতন্ত্র, এটাই জনগণের অভিপ্রায়। এলজিটিবি (সমকামিতা) জনগণের অভিপ্রায়?

এখন আপনি বলুন যে, এদের এই নেটওয়ার্ক, হেজমনি (আধিপত্য) ধ্বংস করার আগে আপনি কিভাবে একটি স্বাধীন ইসলামি সিস্টেম তৈরী করতে পারবেন?

প্রকৃতপক্ষে সেক্যুলারিজম মানে ইসলামফোবিয়া

বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে আল-জুলানীকে প্রশ্ন করা হলো যে, সিরিয়াতে নারীদের মদ লিগাল হবে কিনা। চিন্তা করুন, এত কিছু থাকতে পশ্চিমারা পড়ে আছে মদের বৈধতা নিয়ে, ব্যভিচারের বৈধতা নিয়ে - তাদের কাছে মানবাধিকার, নারীঅধিকার, ইনক্লুসিভিটি (সামগ্রীকতা) বলতে মূলত এসবই।

এসবের বৈধতা না দিয়ে আপনি যতই আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন না কেন, যতই নারীদের শিক্ষিত করে না কেনো - ফ্রি-মিক্সিং করতে না দিলে তাদের মতে আপনি অধিকার হরণ করছেন। যতই গণতন্ত্র গণতন্ত্র করেন না কেন সেটা কখনোই তাদের পছন্দ হবে না।

তারা সেক্যুলারিজম বলতে সকল ধর্মের মানুষের সমান মানবিক অধিকার বুঝায় না, বরং তারা বুঝায় যে আসমানী কোন বিধান তথা ইসলামের বিপরীত আইন থাকতে হবে। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল থাকতে হবে। আল্লাহ যা হালাল করেছে তা হারাম থাকতে হবে। শিক্ষা বলতে তারা তাদের কারিকুলামের শিক্ষা বুঝায়। নতুবা আপনি শিক্ষিত নন। নারীদের তাই শিখাতে হবে, পুরুষদের তা-ই শিখাতে হবে, যা তারা শিখাতে বলে। নতুবা আপনি আসলে নারীদের পড়তে দিচ্ছেন না। পুরুষদের বদলে তারা নারী ইস্যুটা বেশী তুলে ভিকটিম কার্ড প্লে করার জন্য এবং নারীদের সহজে বিভ্রান্ত করার জন্য।

আল-জুলানী অবশ্য একটা কৌশলী উত্তর দিয়েছেন যে, "এটা তো একটা লীগাল ইস্যু। আমাদের সংবিধান বানানোর জন্য কমিটি হচ্ছে বিজ্ঞদের নিয়ে। আমরা সকলেই তা মানতে বাধ্য থাকবো।" অনেক সময় আমরা এরকম ট্রিকি প্রশ্নের উত্তর তাওরিয়াহ করে দিতে পারি না, বরং এমন কথা বলে ফেলি যা আসলে কুফরের অনুরূপ।

আমরা জানি যে মদ হারাম মুসলিমদের জন্য। ফিক্বহী ভাবে প্রশাসন কখনোই প্রকাশ্যে মদের কেনা বেচার অনুমতি দিতে পারবে না। কাফিররা নিজেদের মধ্যে কি করবে, সেটার ব্যাপারে প্রশাসন হয়ত কঠোরতা আরোপ করবে না। কিন্তু মুসলিমরা এসবে লিপ্ত হলে, প্রশাসনকে অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে হবে।

বিবিসির সাংবাদিকের এই মদ নিয়ে প্রশ্ন করার বিপরীতে ব্যাপক সমালচনা হচ্ছে। মানুষজন বিরক্ত হচ্ছে যে, তারা কেবল তাদের ধ্যান-ধারণাকেই মৌলিক এবং স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে বাকি সকলকে মাপার চেষ্টা করে। আমি অনেকের কমেন্টগুলো দেখছিলাম, মানুষজন আসলেই এই পশ্চিমাদের ভিমরতিগুলো বুঝতে পারছে। কেবল কিছু বুইড়া সেক্যুলাররা ব্যতীত। এখনো তাদের পশ্চিমা ভূত মাথা থেকে নামে নি। তবে দিন যত যাবে, পশ্চিমারা যত বেশী মূর্খতামি করবে। আমাদের জন্য সহজ হবে তাদের প্রতারণগুলো, তাদের পরস্পর বিরোধী নীতিগুলো মানুষকে বুঝাতে।

কিছুদিন পূর্বে হিজাব নিয়ে বিতর্ক হলো, যে আল-জুলানী একটা মেয়েকে ঘোমটা দিতে বলছিলেন, তার সাথে ছবি ওঠানোর সময় - শুধুমাত্র এতটুকুতেই সেক্যুলার এবং পশ্চিমাদের শরীর জ্বলে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি যে, প্রকৃতপক্ষে সেক্যুলারিজম মানে ইসলামফোবিয়া। সকল ধর্মের মানুষের প্রতি আদল-ইনসাফ করতে তো ইসলাম হাক্কুল-ইবাদ তথা বান্দার হক্ব,আহলুয-যিম্মা তথা অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারের ধারণা তো ইসলামে অলরেডি আছেই। ইসলামের ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সেক্যুলারিজমের কোন দরকার নেই।

এদিকে আবার সেক্যুলাররা বিভিন্ন জায়গা বিক্ষোভ করছে সেক্যুলারসম কায়েম করার জন্য।

উত্তর পূর্বে কুর্দি সেক্যুলারিস্ট আবার দক্ষিণে দ্রুয কুফফাররা। মাঝে আবার ডোমোক্রেটিক সিরিয়ান সেক্যুলারিস্টরা আছে। আমেরিকা চেষ্টা করছে যতভাবে সম্ভব চাপে রাখা যায় সিরিয়ান নেতৃত্বকে এবং সংবিধানে কোনভাবে সেক্যুলারসিম ঢুকানো যাক।

এখন পুরোপুরি কায়েম করতে না পারলেও, একটা সময় পরে সেই সংবিধানের দোহাই দিয়ে সিরিয়াতে আবার সেক্যুলারসিম কায়েম হবে। আর যদি এখন কষ্ট করে হলেও সংবিধানে কোন রকমের ইসলামবিরোধী জিনিস না রাখা হয়, সল্প মেয়াদের চাপে পড়লেও দীর্ঘ মেয়াদে তা মুসলিমদের জন্য ভালো হবে। নতুবা আবার যুদ্ধ হবে। **হয়তো শরীয়াহ, নয়তো শাহাদাহ!**

শরীয়াহ কায়েম এবং সেক্যুলার গনতন্ত্রের মারপ্যাঁচ

শরীয়াহ কায়েম, সাধ্যমত শরীয়াহ কায়েম এগুলো বলতে আমরা কি বুঝি?

মুসলিম মাত্রই একজন শরীয়াহ কায়েম করবে। সকলেই সাধ্যের মধ্যে শরীয়হ কায়েম করে। কেউই সাধ্যের বাহিরে শরীয়াহ কায়েম করে না। সকলেই নিজের ভার্সনের শরীয়াহ কায়েম করে। আমাদের দেখতে হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে বিধান দাতা হিসেবে মেনে নিচ্ছে কিনা।

তারা কুরআন-সুন্নাহকে মূল উৎস হিসেবে মেনে নিচ্ছে কিনা। অর্থাৎ তারা তাওহীদের স্বীকৃতি দিচ্ছে কিনা। বিধান দাতা হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টা আসছে এই জন্য যে, আধুনিক জাতি রাষ্ট্রে পশ্চিমারা সেক্যুলারিজমকে এমনভাবে সংবিধানের সাথে যুক্ত করে দিয়েছে, যেটার ফলাফল হলো, আল্লাহ তা'আলা বিধানকে অগ্রাহ্য করা। এটা তো গেলো মেনে নেয়ার বিষয়টা।

এবার কায়েমের বিষয়ে আসি। এখানে ২টা জিনিস আছে। এক হলো প্রশাসন, আরেক হলো বিচার ব্যবস্থা। বিচার ব্যবস্থা যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করা হয়, তাহলে তা শরীয়াহ কায়েম, যদিও বিচারকদের ত্রুটি হতে পারে। অর্থাৎ এটা কুফর না, কিন্তু বিচারকদের ত্রুটি, দুর্নীতি, বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির কারণে ভুল হতে পারে। এটা তাকফিরের প্রতিবন্ধক।

অনেক সময় আমরা শরীয়াহ কায়েম বলতে বুঝি হুদুদ কায়েম করা। অথচ হুদুদ পুরো শরীয়াতের একটা অংশ। হুদুদ কায়েম করতে হবে, কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়া, এতে না বাড়াবাড়ি করা যাবে, না ছাড়াছাড়ি।

যেমন দাঈশ হুদুদ কায়েমের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যেন তেনভাবে হুদুদ কায়েম করেছে। হুদুদ কায়েম করা মানেই শরীয়াহ কায়েম করা না। আবার আমরা হামাসের ক্ষেত্রে দেখি যে তারা হুদুদ কায়েমে ছাড়াছাড়ি করে। যদিও তাদের একটা অযুহাত আছে যে, যুদ্ধপরিস্থিতিতে, নাজুক অবস্থায় হুদুদ কায়েমের মত তামকীন তাদের নেই।

কিন্তু বিচার ব্যবস্থায় যদি পশ্চিমাদের কিংবা অন্য কোন আদর্শকে আইনে মূল উৎস হিসেবে ধরে নেয়, যার সাথে কুরআন-সুন্নাহ, মুসলিমদের ইজমা, কিয়াস, সিলসিলার কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি সুস্পষ্টভাবে শরীয়াহ লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

যেমন আমরা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বলি যে, যদিও এর সংবিধান আল্লাহ তা'আলাকে বিধানদাতা হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু এর বিচার ব্যবস্থা আর বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার তেমন পার্থক্য নেই। উভয়টাই এখনো ব্রিটিশদের তৈরী উপনিবেশিক আইনগুলো দিয়ে বিচার করে।

এবার প্রশাসনে আসা যাক। পৃথিবীর সকল প্রশাসনে আসলে শূরার[18] মাধ্যমেই চলে। ফ্যাসিস্টেরও কিছু উপদেষ্টা থাকে। শূরা, পার্লামেন্ট, এ্যাডভাইসার প্যানেল যাই বলেন না কেন বিষয়টা হচ্ছে যে কিছু লোক জনগণকে শাসন করবে। জনগণ নিজে নিজেদের শাসন করতে পারে না। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে, এই কিছু লোক জনগণকে শাসন করার ব্যপারে কতটা আন্তরিক? তাদের আদল বা ন্যায়বিচারের ব্যাপারে কতটা আন্তরিক?

পশ্চিমারা বলে যে, জনগণ নিজেদের থেকে নিজেদের পছন্দের প্রতিনিধি দিয়ে পার্লামেন্ট সাজালে, সেই পার্লামেন্ট মেম্বাররা আন্তরিক হবে। তারা জনগণের কথা ভাববে। অথচ আমরা ইতিহাসে দেখি যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা জনগণের সাথে গাদ্দারী করেছে। এবং জনগণের বদলে তারা পশ্চিমা সহ বিভিন্ন শক্তিশালী পক্ষের কথামত কাজ করেছে, নিজেদের রাজনৈতিক দলের লেজুর বৃত্তি করেছে।

এখানে আমাদের সাথে পশ্চিমাদের কৌশলগত পার্থক্য যে, জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনের মাধ্যমেই আসতে হবে এমন কোন শর্ত ইসলামে নেই। এখানে অনেকে কিন্তু থাকে, যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রার্থীরা যে প্রার্থী নির্বাচনে জিতে নি, তার পক্ষের লোকদের সাথে বৈষম্য করবে কিনা। এমন বিষয়ে কোন সমাধান পশ্চিমারা দেয় না।

ইসলাম এখানে কৃত্রিম এলাকা ভিত্তিক নির্বাচনের বদলে, সাংগঠনিকভাবে ইতিমধ্যে সামাজে যারা প্রভাবশালী, হতে পারে তারা ফাসিক, পূর্বের সময়ে সামজে যারা লীডার, ইতিমধ্যে যাদের জনসম্পৃক্ততা আছে। এরকম লোকদের সাথে পরামর্শ করতে বলে।

[18] শূরা (شُورَىٰ) একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ–"পরামর্শ"। আল কুরআনে মুসলমানদেরকে তাদের সামগ্রিক বিষয়গুলির ব্যাপারে একে অপরের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করে। মূলত ঐ পরামর্শকে শূরা বলা হয়ে থাকে।

কারণ রুট লেভেলের তামকীনের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন আছে। নির্বাচিত প্রতিনিধি একটা কৃত্রিম বিষয়, তার সাথে আসলে জনসম্পৃক্ততার নিশ্চয়তা নেই।

যেমন তালিবানরা বিভিন্ন এলাকার প্রভাবশালীদের নিজেদের পক্ষে নিয়ে নিয়েছে। এজন্য তাদের তামকীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এটা জনগণেরই সরকার,জনগণ তাদের মানে। কিন্তু পশ্চিমারা এটাকে গণতান্ত্রিক সরকার মানবে না, কারণ কৌশলগত মত পার্থক্য ছাড়াও এখানে আদর্শগত মত পার্থক্য আছে।

যেমন ইউনুস সরকারকে তারা মেনে নিয়েছে, অথচ সে কিন্তু নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে নি। বরং তার তামকীন, তালিবানদের চেয়েও কম। এমনকি আল-জুলানীর চেয়েও ইউনুসের গ্রাউন্ড লেভেলে ক্ষমতা কম।

আদর্শগত পার্থক্যটা হলো, পশ্চিমারা পার্লামেন্ট সদস্যদের আইন প্রণেতা হিসেবে তাদের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী করেছে। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের জনগণের পক্ষ থেকে আইন বানানোর ক্ষমতা দেয়া হয়।

অথচ ইসলামে শূরার মূল কাজ আইন বানানো না,বরং কয়েক রকম শূরা হতে পারে। আইন তো কুরআন-সুন্নাহ থেকে হতেই হবে। সাথে সাথে বিভিন্ন ফিক্বহী ইস্যু ডিল করার জন্য সেই বিষয়ে জ্ঞানীদের শূরা থাকবে। গত ১৪০০ বছরের ফিক্বহ আছে। সাথে আরো আছে বিচার ব্যবস্থা।

জনগণের পছন্দের বিষয়, যদি না সেটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। সেগুলোও আমলে নেয়ার কৌশল আছে, এবং নেয়া যাবে। এবং সর্বশেষ যে শাসক পছন্দ অপছন্দেরও বিষয় আছে।

কারণ তিনি মূলত চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। কোন বিষয়ে মত বিরোধ হলে ইমাম তথা আমীরের মতটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আদর্শগত দিকটাতে আমার কখনোই আপোষ করতে পারবো না। বিধানের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ'ই হতে হবে। যদি লিখিত সংবিধান হয় বিচার ব্যবস্থায় অবশ্যই শরীয়াহর জ্ঞান রাখেন এমন বিচারকই নিয়োগ দিতে হবে।

একজন ব্রিটিশ 'ল' (law) পড়ে এসেছেন, তাকে শরীয়াহ কোর্টে বসিয়ে দিলেও সে ব্রিটিশ আইনেই শাসন করবেন। কারণ শরীয়াহতে কি আছে, তার তো জানা নেই। সে পরিভাষাও ব্যবহার করবে সব পশ্চিমাদের।

এখন শাসক তথা আমীর একজন হবে, তার শূরা থাকবে এ বিষয়ে সমগ্র মানবজাতি একমত। এখন শূরা একটাই থাকতে হবে, বিষয়টা এমন না। কয়েকটা শূরা থাকতে পারে বিভিন্ন খাত অনুযায়ী সেই বিষয়ে দক্ষদের নিয়ে। কিছু শূরা অস্থায়ী হতে পারে, স্থায়ী হতে পারে। ইসলাম এসব বিষয়ে নমনীয়, এগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী।

যেমন আমরা খিলাফতে রাশিদাতে দেখি যে, কোথাও আলাদা গভর্নর, আলাদা চীপ জাস্টিস দেয়া হয়েছে। আবার কখনো গর্ভনরকেই চীফ জাস্টিসের পদ দেয়া হয়েছে। আবার কখনো গভর্নরকে জেনারেলের দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে। যখন যে কাজ সে কাজের এক্সপার্টদের নিয়ে তার শূরা করতে হয়েছে।

এখন জনগণের সম্পৃক্ততা, তাদের ইচ্ছা প্রতিফলন কিভাবে হবে তা ইসলামের মধ্য থেকে মেকানিসম তৈরী করা যায়। এটা যে নির্বাচনী, রাজনৈতিক দল ভিত্তিক হতে হবে, এমন কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই।

বরং আমরা দেখি যে পশ্চিমারা এই পদ্ধতিতে ডিভাইড এন্ড রুল (ভাগ করে, শাসন কর) পদ্ধতিতে তাদের নিজেদের স্বার্থ আদায় করেনিচ্ছে। বরং আমার বলি যে, এটা তাদের একটা কৌশল।

আর জনগণের সকল আকাঙ্ক্ষাই যে জাতির জন্য ভালো, এবং তা মানতে হবে এটা পশ্চিমারাও স্বীকার করে না।

যেমন যে রাজনৈতিক দল নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে, তাদের প্রতি কি তাহলে অন্যায় করা হচ্ছে না? তারাও তো জনগণ। তারাও তো সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘু।

অর্থাৎ প্রশ্ন করলে পশ্চিমাদের সিস্টেমের অনেক খুঁত বের করা সম্ভব। তারা যেটা দাবী করে বাস্তবে তারা সেটা তাদের মেকানিসম দিয়ে পূরণ করতে পারে না। কিন্তু যারা তাদের প্রতি মুগ্ধ এবং শুধু তাদেরটাই পড়েছে। ইসলামী সিস্টেম নিয়ে যাদের ভালো রকম ধারণা নেই তারা কখনোই এই প্রশ্নগুলো করতে পারবে না।

কারণ তারা শুরুতেই পশ্চিমাদেরটা পড়েছে, বুঝেছে সেটাকেই মানদণ্ড ধরে বসে আছে। সেটাকে প্রশ্ন করার মত ক্ষমতা তাদের ব্রেইনে তৈরী হয়নি। তাই তারা তাদের সিস্টেমের দোষ দেয় না। গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম এই ধারণাগুলো ভুল দেখে না। শুধু মানুষের ভুল দেখে। কারণ তারা এগুলোকে মৌলিক দ্বীন, ফিতরাহ হিসেবে ভেবে বসে আছে।

যেমন ইসলামে আহলুয যিম্মা কনসেপ্ট আছে। এর মাধ্যমে মুসলিমদের অধীনে বসবাস করা কাফিরদের হাক্কুল ইবাদ তথা আল্লাহর বান্দা হিসেবে তাদের কি কি হক্ব আছে তা বলা আছে।

চুক্তির বিষয়টাও আছে। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না এমন সব চুক্তির অনুমতি আছে কাফিরদের বিষয়ে। অথচ সেক্যুলারদের মতে ইসলামে ন্যায় নেই, তাই সেক্যুলারিজম আনতে হবে। অথচ সেক্যুলারিজমের শাসন কালে আমার মুসলিমদের উপর নির্যাতন দেখতে পাচ্ছি।

অথচ হাজার বছর ইসলামের শাসনে কাফিরদের প্রতিও এরকম নির্যাতন আমরা দেখিনি। সেক্যুলাররা বলে, এটা আসলে সেক্যুলারিজমের দোষ না। অথচ ইসলামে যেমন হাক্কুল ইবাদ, আহলুয যিম্মা ধারণা সুস্পষ্টভাবে আছে।

সেক্যুলারিজমে মানবতাবাদ এবং সকল ধর্মের সমানাধিকার এইসব ধারণাগুলো সুস্পষ্টভাবে নেই কারণ এটা একটা অধার্মিক নাস্তিক্য ধারণা। এখানে শাস্তি দেয়ার অধিকার কেবল শক্তিশালীদের।

অথচ এই শক্তিশালীরাই দেখি ফালিস্তিনে কি করছে, এবং ইসলামের ব্যাপারে তারা কি ধরণের বিদ্বেষ মূলক ধারণা রাখে। অর্থাৎ না আছে তাদের ন্যায়বিচার সুগঠিত আদর্শ।

অথচ ইসলামের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেটা যে বাস্তবায়নযোগ্য তা হাজার বছর ধরে প্রমাণ করে আসছে। পশ্চিমারা এবং তাদের স্থানীয় দোসর সেকুলররা কখনোই তাদের সেক্যুলারিজম ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দিবে না।

কারণ তাদের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনবিধান সেক্যুলারিজম। ইসলাম পালন করতে হলেও, সেক্যুলারিজম যতটুকু অনুমতি দিবে, ততটুকু। আপনি হামাস সাজতে পারবেন না, তাওহীদের পতাকা উড়াতে পারবেন না। এসব সেক্যুলারসিমের সাথে যায় না।

কিন্তু ঠিকই আমি আমার ঘরের সন্তানদের কি পড়াবো, কি পরবো তা নিয়ে তারা প্রশ্ন করবে।

হিজাব পরতে কি বাধ্য করা যাবে? নামায পড়তে? ছেলেদেরই শুধু সংসারের জন্য উপার্জনের দায়িত্ব নিতে হবে, কর্তৃত্ব কি শুধুই তাদের?[19]

[19] হ্যাঁ ছেলেদের সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে এবং উপার্জনেরও। মহান আল্লাহ তাআলা পুরুষকে নারীর অভিভাবক এবং নারীর উপর কৃতিত্বশীল করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। ফলে পুণ্যবান স্ত্রীরা (আল্লাহ ও স্বামীর প্রতি) আনুগত্য থাকে এবং পুরুষের (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন।"

[আন-নিসা, ৩৪]

অর্থাৎ পুরুষ ঘরের বাইরে উপার্জনের দায়িত্ব থাকবে, আর নারী থাকবে ঘরের দায়িত্বে পরিবার, সন্তান-সন্ততি, স্বামীর সম্পদ দেখভাল করতে,নিজের সতীত্ব, ইজ্জত রক্ষা করতে। পুরুষ বাইরে থেকে উপার্জন করে এনে স্ত্রীকে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্যয় করতে দিবে। আর একজন নারী বেশি প্রয়োজন ছাড়া কুরআনের বিধান অনুযায়ী ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না (৩৩:৩৩)। নারী-পুরুষ কার কোথায় কতটুকু কর্তৃত্ব থাকবে কুরআন-হাদিস খুলে দেখুন। সব সূর্যের আলো ন্যায় স্পষ্ট হবে। [বুঝতে অসুবিধা হলে উল্লেখিত আয়াতগুলোর তাফসির পড়ুন।]

অধ্যায়ঃ ২

“ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এন্ড সিরিয়া” (ISIS)

সদ্য গঠিত ইসলামিক স্টেট

দাঈশের অভিযোগগুলোর অনেক অনেক খন্ডন হয়েছে। গত ১০ বছর ধরে হয়ে আসছে। তবুও দাঈশের লোকজন তরুণ যারা সিরিয়ার জিহাদের বিষয়ে তেমন একটা জানে না, তাদের কাছে নিজেদের মন মত করে একটা ইতিহাস বর্ণনা করে অপর মুসলিমদের প্রতি মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

বারবার তাদের জবাব দেয়ার চেয়ে আমি বরং তাদের ইতিহাসটা বলার চেষ্টা করবো সময়ে সময়ে, এতে ইতিহাস থেকে শিক্ষা এবং তাদের কিছু অভিযোগের জবাব পাবেন। তবে সকল অভিযোগের জবাব যেন আপনারা নিজেরাই বের করতে পারেন, এর জন্য ইতিহাস থেকে শিক্ষাটা জরুরী।

দাঈশকে চিনতে হলে আপনাকে সিরিয়া না, আগে ইরাকে যেতে হবে। আমিও ইরাকের দাঈশকে এই আপাতত কেন্দ্রবিন্দু করবো।

ইরাক আক্রমণের পরে আমেরিকা ইরাকী সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে নতুন সেনাবাহিনী এবং প্রশাসন তৈরী করার চেষ্টা করে। এবং সেখানে শিয়ারা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে, সুন্নীরা খুব একটা সুযোগ পায় না।

এ কারণে সুন্নী মুজাহিদ গ্রুপগুলো ব্যাপক জনসমর্থন পেতে শুরু করে। এমনকি সাদ্দামের সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত সেনারাও এসব বাহিনীতে যোগদান, তাদের প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব, অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে থাকে।

অনেকগুলো মুজাহিদ দল থাকলেও, আবু মু'সআব আয-যারকাওয়ী (রহ.) এর জামাতুত তাওহীদ ওয়াল জিহাদ তথা আল-কায়দা ইন ইরাক ছিল সবচাইতে অভিক্ষিপ্ত এবং দূর্ধর্ষ। সিরিয়া, জর্ডান এবং আরবের অন্যান্য জায়গা থেকে মুজাহিদরা এই দলের সাথেই যোগদান করা শুরু করে।

মূলত এই আল-কায়দা'ই ছিল তখনকার নেতৃত্ব দানকারী দল। সাথে আরেকটা ঐতিহ্যবাহী দলের নাম না বললেই না, যা এখনো অস্তিত্বে আছে, সেটা হলো কুর্দীদের আনসার আল-ইসলাম।

আয-যারকাওয়ী মার্কিনদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মার্কিনীদের মূল মাথা ব্যাথার কারণ। কিন্তু সুন্নীরা শিয়াদের উপর চরম ক্ষিপ্ত ছিল, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সুযোগের অপব্যবহারের কারণে। আফগান থেকে আল-কায়দা মূল নেতৃত্বের নির্দেশ ছিল যে, শিয়াদের সাথে যেন যুদ্ধে না জড়িয়ে যায়, এরপরও আল-কায়দা'ই শিয়াদের সাথে পার্শ্বীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম বড় উসূল হলো, পার্শ্বীয় যুদ্ধে জড়ানো যাবে না। আপনার সামনে আরেকটু গেলে বুঝবেন যে, কেন ইরাকের গেরিলা যুদ্ধ ব্যর্থ হলো, কিন্তু আফগানেরটা সফল হলো। এর একটা কারণ আফগানের গেরিলারা পার্শ্বীয় যুদ্ধে জড়ায় নি, কিন্তু ইরাকের গেরিলারা জড়িয়েছিল।

এরকম যখন চলছিল, ২০০৬ সালে আমীর আবু মুসা'ব (রহ.) মার্কিন এয়ার স্ট্রাইকে (বিমান হামলা) শহীদ হন। তখন আল-কায়দা'ই এর ডেপুটি ছিলেন আবু হামজা আল-মুহাজির। ওনার মৃত্যুর কিছু পরে, আফগানের আল-কায়দা শুনতে পায় যে, ইরাকে একটা স্টেট ঘোষণা করা হয়েছে।

অর্থাৎ আল-কায়দা সহ অন্যান্য কিছু মুজাহিদ গ্রুপ মিলে একটা শূরা গঠন করে, এরপর ওই শূরা আবু উমার আল-বাগদাদী যিনি অন্য একটা গ্রুপের আমীর ছিলেন, গঠিত শূরা ওনাকে সদ্য গঠিত ইসলামিক স্টেট অব ইরাকের (ISIS) আমীর ঘোষণা করে।

আফগানে আল-কায়দা এ ঘোষণায় অবাক হয়। যখন তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তখন আবু হামজা জানান যে, এটাই পরিস্থিতির দাবী ছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। বরং এই নতুন স্টেটটি আল-কায়দার গ্লোবাল জিহাদের অংশ হয়েই কাজ করবে, তারাও আল-কায়দার একটি তীর - এই বলে আশ্বস্ত করা হয়।

এই যে নতুন স্টেট তৈরী হলো এ জিনিসটাকেই আইএস-এর সমর্থকরা প্রমাণ হিসেবে হাজির করে যে, এখান থেকেই তারা একটা স্বাধীন ইমারাহ'র অধিকারী হয়েছে। তারা আর আল-কায়দার নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। তারা আর আফগানের ইমারা'র অধীনস্ত কোন বাহিনী নয়।

বরং তারা হলো রাষ্ট্র, আর রাষ্ট্র কি করে সংগঠনের আনুগত্য করবে? বরং সংগঠনকে রাষ্ট্রের আনুগত্য করতে হবে। তাই আল-কায়দা'র উচিত আইএস-এর আনুগত্য করা। ঠিক যেমন ইরাকের আল-কায়দা এই ইরাকের ইসলামিক স্টেট-এর আনুগত্য হয়েছিল, মূল আল-কায়দা নেতৃত্বের অনুমতি ছাড়াই।

কিন্তু ইরাকের আল-কায়দার এই কাজটা ভুল ছিল। এবং একই ভুল সিরিয়ার আল-কায়দাও পরবর্তীতে করে। যাইহোক, গেরিলা যুদ্ধের নিয়মানুসারে আল-কায়দা কিংবা ইরাকে সকল মুজাহিদরা কোনভাবেই স্টেট (প্রদেশ/রাজ্য) ঘোষণার পর্যায়ে ছিল না। স্টেটটা ছিল জাস্ট একটা নাম। তারা তখনো একটা গেরিলা দল, বেশীর থেকে বেশী হলে কিছুটা মিলিশিয়া টাইপের চেয়ে বেশী কিছু ছিল না।

গেরিলা যুদ্ধে রাষ্ট্র তৈরী হয় বিজয়ের পর, কিংবা তৃতীয় মারহালায়। অথচ ইরাকের যুদ্ধ তখন প্রথম মারহালাই পার করেনি ঠিকমত।

প্রথম মারহালায় রেইড-এ্যামবুশ (ঘাপটি মারা এবং অদৃশ্য আক্রমন) চলবে শুধু। দ্বিতীয় মারহালায় গিয়ে গেরিলারা কিছু কিছু জায়গায় প্রকাশ্য হওয়া শুরু করবে। কিছুটা জনগণের ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করবে, কিন্তু অফিশিয়ালি জনগণের নেতৃত্ব নিবে না। এবং যে কোন সময় জায়গা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত থাকবে। জায়গা দখলে রাখার জন্য দ্বিতীয় মারহালায় তারা কখনোই সম্মুখ সমরের পথ বেছে নিবে না। বরং মধ্যস্ততা করবে।

কিন্তু ইরাকের স্টেট এই সবগুলো ভুল করে। যেহেতু স্টেট ঘোষণা করেছে, তাই অফিশিয়ালি জনগণের দায়িত্ব তাদের কাঁধে। এবং জায়গা ধরে রাখারও একটা বিষয় চলে আসে। এবং তারা কিছু জায়গায় প্রকাশ্য হয়, এবং জায়গা ধরে রাখতে মার্কিনদের সাথে ব্যাপক যুদ্ধও করে।

কিন্তু প্রকাশ্যে চলে আসায় এয়ার স্ট্রাইকের বিপরীতে তাদের কোন ডিফেন্স ছিল না। এবং সুন্নী জনগণের একটা অংশ বিশেষ করে গোত্রীয় লীডাররা তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। এটা কিছু আছে মার্কিনীদের প্ররোচনায়, কিছু স্টেটের নিজস্ব মিস-ম্যানেজমেন্টের (হারানো ব্যবস্থাপনার) কারণে।

এটাও গেরিলা যুদ্ধের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, তারা জনগণের সমর্থন ধরে রাখবে। কোনভাবেই জনগণের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যাবে না। দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব জোর করেনিলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

শুরুতে শিয়া, এর পরবর্তীতে সুন্নীদের একাংশের সাথেও বিরোধে জড়িয়ে ইরাকের স্টেট মূলশত্রু মার্কিনদের জন্য গেইমটা সহজ করে দিয়েছিল, তাও আবার নিজেরা প্রকাশ্য চলে এসে। এর প্রতিটা কাজ ছিল গেরিলা যুদ্ধের জন্য কাউন্টার প্রোডক্টিভ।

এবং তারাও আবারও তথাকথিত স্টেট থেকে গড়পড়তার একটা গেরিলা যোদ্ধা দলে পরিণত হলো, যারা গেরিলা যুদ্ধের প্রথম মারহালায়'ই রয়ে গেলো।

এদিকে আফগানে কিন্তু খুব ধীর গতির খেলা হচ্ছিল। নিশ্চিত না হয়ে প্রথম মারহালা থেকে দ্বিতীয় মারহালার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল না। প্রকাশ্যে আসলেও আফগানে রিট্রিট করার বহু নযির আছে সম্মুখ যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ইরাকের মুজাহিদরা ফাস্ট, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বেশী করেছিলো সত্য, কিন্তু তাদের সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের তাড়াহুড়ো থেকে আফগানের ধীর গতির খেলাটা বেশী ফলদায়াক হয়েছে, যা আজকে আমাদের সবার কাছে প্রমাণিত।

ইরাকের স্টেট ঘোষণা করার পরও, কেন আল-কায়দা তাদের কিছু বললো না? আল-কায়দা কিছু বলে নি যে তা না। যেহেতু এটা কৌশলগত বিষয় তাই শুধু কৌশলগত ভুলের কারণে কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা যায় না। এরকম কৌশলগত ভুল পাকিস্তানেও কম হয়নি। কিন্তু আল-কায়দাকে আশ্বাস্ত করায়, আল-কায়দাও ইরাকের স্টেটকে মেনে নেয়। সব দলকে স্টেটের অধীনে আসতে বলে।

কারণ আলাদা থাকার চেয়ে একসাথে থাকা ভালো। আর স্টেট তৈরী মূল উদ্দেশ্যই ছিল একটা দল তৈরী করার। কাজের স্টেট না হলেও অন্তত ঐক্যের জন্য একটা স্টেট নামে থাকলে তো কোন ক্ষতি নেই।

এখানে বিতর্কের জায়গা হলো যে, আইএস-এর লোকেরা শাইখ জাওয়াহিরীর একটা বক্তব্য শো করে যেখানে তিনি ইরাকের এই দাওলাহকে ইরাকের সকলে বা'য়াহ দিতে বলেন, এবং আবু উমার আল-বাগদাদীকে আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে সম্বোধন করেন। এ থেকে তারা প্রমাণের চেষ্টা করে যে, আবু উমার স্বাধীন ইমারাতের আমীর!

এই ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, আল-কায়দা হয়ত পরিস্থিতির জন্য তখন প্রকাশ্যে তাদের আলিঙ্গন করেছিল, পরবর্তীতে এরা এমন করবে জানলে হয়তো এরকম ভাবে সম্বোধন করা হতো না। কিন্তু অভ্যন্তরীণি তাদের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে বিভিন্ন চিঠির জবাবের তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক এবং দিক নির্দেশনা দেয়া হতো।

এভাবে আবু উমার আল-বাগদাদী (রহ.)ও মার্কিন এয়ার স্ট্রাইকে শহীদ হন। এরপরই আবু বকর আল-বাগদাদীকে আমীর ঘোষণা করা হয়। আল-কায়দার আশা ছিল এবার অন্তত তাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে আমীর নিয়োগে, কিন্তু এবারও আগে আমীর নিয়োগ করে, তারপর তার ব্যাপারে আল-কায়দাকে জানানো হয়।

আল-কায়দার আর তখন কি করার! তারা শুধু তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে চেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

অপরিপক্ক বুঝ,অহংকার তাদের ধ্বংস করলো

ইরাকের যুদ্ধটা খেয়াল করলে দেখবেন যে, বারবার গেরিলা যুদ্ধের নিয়মগুলো তারা ভঙ্গ করছিল। কেমন যেনো নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের একটা ইচ্ছা। এটা শুধু দাঈশ না, প্রত্যেক দল, এমনকি জিহাদী না এমন দলের বিষয়গুলো এমন তারা নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ করতে চায়। যুদ্ধের কথা বললে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের উসূল, ফিক্বহ সামনে নিয়ে আসে। নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ ব্যাপক সাহস দেখানোর সুযোগ থাকে, অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধ হলো ধৈর্য আর টিকে থাকার লড়াই।

আর শরীয়াহ কায়েমের বিষয়টা কেমন? দাঈশের এমন একটা ঘটমান বিষয় যে, শুধুমাত্র হুদুদ কায়েমকেই তারা শরীয়াহ কায়েম কিংবা এর অনুপস্থিতিকেই তারা শরীয়াহ বর্জন হিসেবে ধরে নেয়।

এখন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হুদুদ কায়েমের বিষয়টা কেমন? আমরা সাহাবাদের কাছ থেকে দেখি যে, তারা যুদ্ধকালীন সময় তো দূরের কথা, যুদ্ধের পরও কিছু সময় হুদুদকে কিছু সময় স্থিতিশীল রাখতেন। আবার ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলে তো হুদুদ কায়েম হবে না।

একবার এক মহিলাকে প্রায় রজমের জন্য পাঠানোই হচ্ছিল। আলী (রা.) এসে বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কি তোমাকে ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছিল। মহিলাটি ইতিবাচক উত্তর দেয়ায়, আলী (রা.), উমর (রা.) কে বলেন, ইয়া! আমীরুল মু'মিনীন তাকে রজম করানো যাবে না। তার সাথে জবরদস্তি করায় জিজ্ঞাসাবাদের সময়। অর্থাৎ কোন রকম সন্দেহ, জোরাজুরি করা যাবে না।

হুদুদ কায়েম করতে হবে সচ্ছতার সাথে। কোনরকম হুদুদ কায়েম করার নামই শরীয়াহ না। খলিফাদের জীবনী আর সাহাবীদের জীবনী বিস্তারিত জানা থাকলে বুঝবেন শুধু হুদুদ দিয়ে শরীয়াহ কায়েম করা সম্ভব নয়। অথচ দাঈশ কোন রকমের একটা জায়গা পেলেই ওখানে শরীয়াহ কোর্ট বসিয়ে বিচার শুরু করে।

তারা মনে করে, যেহেতু হুদুদ কায়েম অনেক সওয়াবের কাজ, সেহেতু যেভাবেই হোক তা কায়েম করতে হবে। অথচ বিষয়টা জোর করার না, কাউকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর সুযোগ থাকলে তাকে ছাড় দিতে হবে। সাহাবাদের কাজ, খলিফাদের সুন্নত তো চর্চা দূরের কথা, জানা ই নেই আমাদের।

এরা এক একজন আসে শরীয়াহ কায়েম শিখাইতে। হুদুদ কায়েম শিখাইতে। জানা ছাড়া অস্ত হাতে নিয়ে কেউ যদি শাসন করতে বসে যায়, সে তো সন্ত্রাসী আর ডাকাতে পরিণত হবে। দাঈশের কাছে তাওহীদ ছিল, কিন্তু ইসলামের ফিক্বহ ছিল না, দুনিয়ার ফিক্বহও না।

গেরিলা যুদ্ধ রাজনৈতিক বিজয় অনেক বেশী গুরত্বপূর্ণ। আফগানে যে রাজনৈতিক বিজয়টা অর্জিত হয়েছিল আমেরিকার সাথে চুক্তি করে। অথচ দাঈশ এরকম চুক্তিকে হারাম মনে করে। রাজনৈতিক ভাবে বিজয়ী হতে হবে, এই ধারণাটাই তারা অস্বীকার করে। তাদের থিওরী হলো, যাবো জয় করবো,শাসন করবো।

এরকম হলে তো ভালোই হতো, কিন্তু এটা এখন বাস্তব সম্মত না। বাস্তব সম্মত হলে তো আমাদের আর গর্তে থেকে গেরিলা যুদ্ধ করতে হতো না। বরং আমরা দুর্বল, সংখ্যায় কম দেখেই আমাদের বেশী কৌশলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আমাদের এয়ার ডিফেন্স নাই। তো আমরা প্রকাশ্যে আসার নামঃ হলো ধুমধাম এরিয়ায় বম্বিং এর শিকার হওয়া। এরকম অবস্থায় কি আমাদের জন্য হুদুদ কায়েম ওয়াজিব? কমনসেন্স বলেও একটা কথা আছে। বরং একটা রাজনৈতিক সমঝোতা বা দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে শত্রুর ক্লান্তির বদৌলতে আমরা কিছু সময় প্রকাশ্যে আসতে পারি, তাও যে কোন সময় রিট্রিটের মানসিকতা নিয়ে। এই প্রকাশ্য সময়টাতে আমরা অরাজকতার ব্যবস্থাপনা করবো। জনগণের হৃদয় জয় করার চেস্টা করবো। এতে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সহজ হবে, এই গেরিলারা ব্যর্থ হলেও জনগণের থেকেহৈ নতুন গেরিলা মুভমেন্ট তৈরী হবে। আফগান-ফিলিস্তুনের গেরিলারা তা পেরেছে, ইরাকের গেরিলারা তা পারেনি।

গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে অজিহাদীদের তো ব্যাপক ভুল ধারণা আছে, জিহাদীদেরও সেই ভুল ধারণা কম না।

"ডাক দিলেই ঝাপিয়ে পড়বো" এটা সাহাবাদের জামানার সম্মুখ সমর না যে ডাক দিলেই ঝাপ দিতে পারবেন।

তাও আবার তাদের মত প্রস্তুতি ছাড়াই। সবাই যুদ্ধের যে কল্পনা হাজির করে, তা হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক সম্মুখ সমরের। মুসলিমদের তথা জিহাদীদের আসলেই এইটা করার সামর্থ্য নেই। এই জন্যই একদল লোক জিহাদকেই পিছিয়ে দেয়, দিফাকেই অস্বীকার করে বসে।

কারণ তারা গেরিলা যুদ্ধের স্বরূপ জানে না। একে কাপুরুষতা বলে বসে। অথচ কাপুরুষতা তো বলবে সরকারপক্ষ, যাদের বিরুদ্ধে গেরিলারা যুদ্ধ করছে। গেরিলাদের সাথে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটা অংশ এই যে, তাদের যুদ্ধ কে অবৈধ, কাপুরুষতা ঘোষণা করা আর নিজেদেরকে সেই ভূমির একমাত্র বৈধ বাহিনী দাবী করা।

এখন আলেমরা এখানে সরকারের মত গেরিলাদের অবৈধ বলার অর্থ হলো, তারা সরকারের পক্ষ নিয়েছে। হয় তারা গেইমটাই বুঝে নাই যে, এসব কথাবার্তা রাজনৈতিক, কুওয়াত, বৈধ দাবীদার, কাপুরুষতার যুদ্ধ এসব রাজনৈতিক ম্যারপ্যাঁচে আটকে পড়বে। আপনি যার ন্যারেটিভের পক্ষে থাকবেন, সেই আসলে শক্তিশালী হতে থাকবে।

তাই গেরিলাদের এমন কিছু করতে হবে, যেন আলেমদের পক্ষে রাখতে পারে। এজন্য আগে নিজেদের ধারণা ক্লিয়ার রাখতে হবে। নতুবা আলেমরা সরকারের কোলে বসে পড়লে গেরিলাদের যুদ্ধ করতে কষ্ট হবে। অনেক ধৈর্য্য ধরতে হবে, স্লো হয়ে যেতে হবে মাত্রাতিরিক্ত।

কারণ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের প্রতিপক্ষের মাঝে আলেমরা দাড়িয়ে গেছে, তাদের সাথে আছে তাদেরও বিশাল সংখ্যক আওয়াম সমর্থক। এখন এদের সাথে সংশয় নিরসন তথা দাওয়াত এবং পরামর্শের সম্পর্ক না গড়ে, এদের সকলের সাথে সংঘর্ষের সম্পর্ক গড়লে গেরিলা যুদ্ধ আর সম্ভব হবে না। হ্যাঁ এদের মধ্যে সকলের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখাটা কঠিন হবে। কারণ কিছু লোক সরকার কিংবা বিদ্যমান ব্যবস্থার পক্ষেই থাকবে। এখন এদের সংখ্যাই যদি বেশী হয়, তাহলে সেটা গেরিলা যুদ্ধের জন্য অনুর্বর ভূমি। এখানে গেরিলারা টিকে থাকতে পারবে না।

গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রাকৃতিক কিছু বৈশিষ্ট্য লাগে। যেমন যথেষ্ট পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, অনেকগুলো দেশের সাথে বর্ডার, মোটামুটি বড় একটা দেশ, ইত্যাদি। এগুলোর কোনটার কমতি থাকলেও জনগণের সাপোর্ট মুসলিমদের ক্ষেত্রে এর সাথে যোগ হবে আলেমদের সাপোর্ট এগুলো খুব প্রবলভাবে থাকতে হবে টিকে থাকার জন্য।

আফগানে প্রাকৃতিক সাপোর্টের সাথে জনগণের, আলেমদের সাপোর্টও ছিল। ইরাকের বৈশিষ্ট্য কিন্তু আফগানের চেয়ে কম শক্তিশালী গেরিলাদের জন্য। কারণ আফগানের পাথুড়ে পাহাড়ের গুহাগুলো গেরিলাদের জন্য ন্যাচারাল এয়ার ডিফেন্স (প্রাকৃতিক আকাশ প্রতিরক্ষা)।

অন্যদিকে ইরাকে এমনটা ছিল না। আর বেশীরভাগ ছিল আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার (শহুরে গেরিলা যুদ্ধ)। এই পদ্ধতির কার্যকারীতা এবং বিজয়ের রেকর্ড সবচাইতে কম গেরিলা যুদ্ধের ভ্যারিয়েন্টগুলোর মধ্যে, যেমনটা ফিলিস্তিনেও।

তাদের ন্যাচারাল ডিফেন্স নেই, কিন্তু তারা কৃত্রিম ডিফেন্স, মাটির নীচে সুড়ঙ্গ (টানেল) তৈরী করেছে। আর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দুর্বলতার বিপরীতে তাদেরকে ব্যপকভাবে জনগণের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার, শহর কেন্দ্রিক বা শহরের মাঝে যে গেরিলাযুদ্ধ চলে, জনগণ সবচাইতে ভরনারেবল পজিশনে থাকে। তাই তাদের সাথে সম্পর্ক এত ভালো থাকতে হবে যে, তারা নিজেরাই যেন কুরবানির জন্য রাজী হয়ে যায়।

গাজ্জাতে জাস্ট জনগণের সাপোর্ট, তাদের কুরবানী যুদ্ধটাকে এখনো টিকিয়ে রেখেছে। অথচ দাঈশ এই সাপোর্টটা জনগণ থেকে পায়নি, দাঈশের দোষেই। জনগণকে আপনি অনেক বেশী পরহেজগার এরকম আশা করতে পারেন না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকরজম অনাচার থাকা সত্ত্বেও তাদের ঈমানী সাপোর্ট টা আপনাকে বের করে আনতে হবে।

এটা আমাদের মাল্টিডাইমেনশনাল ওয়ারফেয়ারের (বহুমাত্রিক যুদ্ধের) একটা অংশ, একটা চ্যালেঞ্জ। ফিলিস্তিনে এটা সম্ভব হয়েছে, ইরাকেও কিছু হয়েছিলো, সিরিয়াতেও কিন্তু আমাদের তাড়াহুড়ো শরঈ রাজনীতি আর বাস্তবতার অপরিপক্ক বুঝ নিজেদের পরহেজগারিতা, আর বুঝ নিয়ে অহংকার অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতাকে সম্মান না করার প্রবণতা আমাদের ধ্বংস করল।

৮০'র দশকের সিরিয়ার ইতিহাস এবং ইসলামিক স্টেট অব ইরাক থেকে ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এন্ড সিরিয়া গঠনের প্রস্তাব

সিরিয়ায় কি হয়েছিল তা বুঝতে হলে আপনাদের সিরিয়া ইতিহাসটা জানতে হবে। আমি শুধু সংক্ষেপে বলছি।

উসমানীদের পতনের পর ব্রিটেন আর ফ্রান্স সইকস-পিকট চুক্তি করেনিজেদের মধ্যে আরব বিশ্ব ভাগ করে নেয়। সেই ভাগাভাগিতে সিরিয়া পড়েছিল ফ্রান্সের ভাগে।

এইরকম উপনিবেশিক শক্তিগুলো শাসন করার জন্য স্থানীয় কিছু বাহিনী এবং এলিট শ্রেণী তৈরী করে যাদের দিয়ে তারা শাসন করে, যেমন উপমহাদেশে জমিদারী সিস্টেম, ভারতীয়দের দিয়ে তৈরী করা সেনাবাহিনী, পরবর্তিতে ভারতীয়দের প্রশাসন দিয়েই কিন্তু ব্রিটিশরা শাসন করতো। কারণ এত জনবল ছিলো না। ঠিক তেমনি ফ্রান্সও সিরিয়াতে এই কাজটা করেছিল। তারা এক্ষেত্রে একদল জনবিচ্ছিন্ন ডাকাত দলের সাহায্য নেয়।

এই ডাকাত দলটা সভ্য সমাজের সাথে কখনোই তেমন একটা ছিল না। এরা আক্বীদায় আলাভী শিয়া, আলী (রা.) - কে আল্লাহ ভাবে এরকম কিছু আক্বীদাহ - নাউযুবিল্লাহ। তাদেরকে নুসাইরী শিয়াও বলা হয়।

তো এদের দিয়েই ফ্রান্স সিরিয়া শাসন করে, এদের দিয়েই সেনাবাহিনী, প্রশাসন বানায়। আর স্বাধীনতা দেয়ার সময়ও এদের হাতেই ক্ষমতা ছেড়ে যায়।

এদেরই একজন হচ্ছে, বাশার আল-আসাদের বাবা, হাফিজ আল-আসাদ। সেই ৭০-৮০ দশক থেকেই ইসলামিস্টরা এদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার চেষ্টা করে আসছে। আর এরা যে পরিমাণ নির্যাতন তৎকালীন মুসলিম ব্রাদারহুড কিংবা ইসলামিস্টদের করেছে, লীগ সেই তুলনায় তেমন কিছুই করেনি। এর একটা ভাইব পেতে আপনারা "জাস্ট ফাইভ মিনিটস" বইটা পড়তে পারেন।

৮০ 'র দশকে এই হাফিজ আল-আসাদ মুসলিমদের উপর হামাতে এক গণহত্যা চালায়। তৎকালীন মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধে যখন হাফিজ আল-আসাদ কোনঠাসা, সে মুজাহিদদের সাথে ডিল করে যে, তাদের জন্য একটা জায়গা ছেড়ে দিবে। মুজাহিদরা স্বানন্দ্যে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে, যখনই নিজেদের প্রকাশ করা শুরু করলো, ওই শহরে গিয়ে জড়ো হলো - আসাদ বিশ্বাস ঘাতকতা করে তাদের গণহত্যা করলো। ইসলামী বিপ্লব পঙ্গু হয়ে গেলো।

গেরিলা যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সাথে ডিলে যাওয়ার মারহালাও হচ্ছে তৃতীয় মারহালা। এসময়টাতে দরকষাকষি চলতে পারে, এর আগেই নিজেদের প্রকাশ করে ফেললে, যখন শত্রু যথেষ্ট ক্লান্ত কিংবা দুর্বল নয়, তখন এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে। সেই বিপ্লব তো গেলোই। সেই বিপ্লবেরই এক সন্তান হলেন আবু মুসা'ব আস-সুরী, যাকে গ্লোবাল জিহাদের আর্কিটেক্ট (স্থাপতি/নির্মাতা) বলা হয়। যদি তিনি বেঁচে থাকেন, আল্লাহ তার জন্য সহজ করুক। অনেকের মতে তিনি সিরিয়ার কোন কারাগারেই আছে। তাকে পাকিস্তানী গোয়েন্দার আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল ২০০৪ এর দিকে।

৮০ 'র দশকের বিপ্লবে ইখওয়ানের সমর্থন ছিল। কিন্তু তাদের নেতৃত্বগত ব্যর্থতাও ছিল বিপ্লবের ব্যর্থতার অন্যতম বড় কারণ। ইখওয়ানের রাজনৈতিক নেতারা বারবার জিহাদী আন্দোলনগুলোকে ব্যর্থ করছিল। জনগণ ইখওয়ানের মাধ্যমেই মুজাহিদদের সাহায্য করতো।

কিন্তু ইখওয়ানের নেতারা ময়দানের স্বার্থের বিপরীতে তাদের স্থানীয় রাজনৈতিক সুবিধাকে বেশী প্রাধান্য দিতো, মুজাহিদদের বাধ্য করতো সেই অনুযায়ী কাজ করতে। না মানলে তারা সাহায্য অফ করে দিয়ে তাদের বিপদে ফেলতো। এই কথাগুলো এখনো প্রাসঙ্গিক এবং এখনো ঘটছে তাই উল্লেখ করলাম।

৮০ 'র দশকের ব্যর্থতার পর, ২০১১ তে আবার বিপ্লবের দামামা বেজে উঠলো যখন সিরিয়ান বিমান/সেনা বাহিনীর সুন্নী অফিসাররা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এতদিনে হাফিজ আল-আসাদের পর তার ছেলে বাশার ক্ষমতায়। টিনেজারদের গুম করাকে কেন্দ্র করে, প্রটেস্টে গুলি করার বিপরীতে এই বিদ্রোহের জন্ম হয়।

সুন্নী এই আর্মিরা ফ্রি সিরিয়া আর্মী গঠন করে, তাদের অধীনে কিছু এলাকা নিয়ে নেয়, বিশেষ করে পূর্ব অঞ্চল। আরো অনেক জায়গায় স্থানীয়রাও বিদ্রোহে যোগদান করে, সরাকারি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু করে। আমেরিকা-ইউরোপ, আরব বিশ্ব, তুর্কি সকলে এই বিদ্রোহে সমর্থন জানায়।

এর মাঝে মুসলিম ব্রাদারহুড সহ অন্যান্য ইসলামপন্থীরা মিলে ইসলামিক ফ্রন্ট গঠন করে। এর অধীনে বিভিন্ন ঘরাণার ইসলামী দলগুলো ছিল। কাতার কিংবা তুর্কি,সাউদী উৎসাহিত দল। এরা মূলত শরীয়াহ–ইসলাম ভিত্তিক বিপ্লবের জন্য যুদ্ধ করছিল। আবার ফ্রি সিরিয়ান আর্মির অধীনের গণতান্ত্রিক সেক্যুলররাও লড়াই করছিল।

বিএনপি টাইপ দল ধরেন আরকি।আমেরিকা-ইউরোপেরর সাহায্যের জন্য যারা মুখিয়ে থাকে।

এই সময়টাতে আল-কায়দা, ইরাকের স্টেটকে সিরিয়ান জিহাদকে সাহায্যের জন্য যেতে বলে। তখন ইরাকে থাকা, বিশেষ করে সিরিয়ান মুজাহিদদের নিয়ে জাবহাতুন নুসরাহ নামে একটা দল গঠন করে সিরিয়াতে পাঠায়। যদিও আইএসের লোকেরা এটা অস্বীকার করে যে, তারা আল-কায়দার নির্দেশে এমনটা করেছিল, তাদের দাবী তারা নিজ থেকেই করেছিল।

যাইহোক, জাবহাতুল নুসরাহ খুব দ্রুতই সবচেয়ে প্রভাবশালী বাহিনীতে পরিণত হলো। অনেক অনেক তরুণ হিজরত করা শুরু করলো। চেচনিয়া, এমনকি তুর্কিস্তান থেকেও মুজাহিদরা হিজরত করলো।

এমনকি আফগান থেকেও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের পাঠানো হয়েছিল। হামাসের সমর্থন সহযোগিতা ছিল এই বিদ্রোহে। অর্থাৎ সমগ্র সুন্নীরা একযোগে যুদ্ধে লড়ছে। ২০১২-১৩ সালেই অর্ধেক সিরিয়া মুজাহিদদের অধীনে চলে আসলো। এ এক অভাবনীয় সাফল্য।

ঠিক তখন ইরাকের স্টেট দাবী করলো যে, এখন আর জাবহাতুন নুসরাহ নামে কোন দল থাকার দরকার নেই। বরং সিরিয়ার এই মুক্ত অঞ্চল দখল করে ইসলামিক স্টেট অব ইরাক এন্ড সিরিয়া, তথা আইসিস গঠন করা হবে। তারাইরাক আর সিরিয়ার কোন বর্ডার মানে না। এই ঘোষণা তারা ২০১৩ এর রমজানে দেয়। কিন্তু জাবহাতুন নুসরাহ সেই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে।

একে তো মুক্ত অঞ্চল জাবহাতুন নুসরাহ একা জয় করেনি, বরং ইসলামিক ফ্রন্টও শামিল ছিল। ফ্রি সিরিয়ান আর্মিও শামিল ছিল। এখন হঠাৎ যদি বাগদাদী সকল মুক্ত অঞ্চল নিজের সাম্রাজ্য বলে দাবী করে, তাহলে বুঝেন এখানে কি রকম মতবিরোধ তৈরী হতে পারে?

কিন্তু এই ঘোষণা দেয়ার আগেই বাগদাদী নিজের অলরেডি ৬ মাস আগে থেকেই সিরিয়ায় অবস্থান করে বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপ থেকে বা'য়াত নেয়া শুরু করেছিল।

এই ঘোষণার পর যারা স্টেট তৈরীতে আগ্রাহী, বিশেষ করে জাবহাত থেকে যারা আইসিসে যাবার, তারা অস্ত্র-সরঞ্জাম নিয়ে আইসিসে যোগদান করলো।

শুরুতে আইসিসি একটা দল হিসেবেই বাকি সবগুলো দলের সাথে মিলে বাশার আল-আসাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু এর ভিতরে ভিতরে তারা একটা কাজ করছিল যে, তারা মুক্ত অঞ্চলগুলো তে শরীয়াহ কোর্ট স্থাপন করতো, সেখানে তারা নিজেদের লোকদের বিচারক নিয়োগ করতো, আর বিচার করতো।

কারণ তাদের মতে শরীয়াহ কায়েম করতেই হবে। কথা সত্য, কিন্তু তারা শুধু তাদের লোক নিয়োগ করতো, এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হুদুদ কায়েমের শিথিলতা মানতো না, যেনতেন ভাবে তাদের বিচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। যা অন্যান্য দলের কখনোই মানার কথা না।

আরেকটা কাজ করছিলো তারা, বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দলের কাছে গিয়ে বা'য়াত চাইতো, নতুবা ওই জায়গা ছেড়ে দিতে বলতো। এরকম একবার একটা দল করে কি, যারা বা'য়াত চাইতে গিয়েছিল, তাদের অর্থাৎ আইসিসের ৩০-৪০ জনকে হত্যা করে ফেলে। এর পরবর্তীতে আইসিসও সেটার প্রতিশোধ হিসেবে তাদের হত্যা শুরু করে।

আল-কায়দার শুরুতে ইচ্ছা ছিল না নিজেদের প্রকাশ করার। তাদের ইচ্ছা ছিল ইসলামিক ফ্রন্টের দলগুলোকে অভ্যন্তরীণি গ্লোবাল জিহাদের সাথে যুক্ত করা এবং সৌদী, কতার কিংবা তুর্কি নির্ভরতা কমিয়ে আনা।

কিন্তু আইসিস ঘোষণার পর, জাবহাতুন নুসরাহর আমীর আল-জুলানী, বাগদাদীর আদেশ মানতে অস্বীকার করে, শাইখ জাওয়াহারীকে বা'য়াত দেন। তার মতে বাগদাদী, শাইখ জাওয়াহিরীর অনুগত, তাই তিনি শাইখ জাওয়াহিরী যেই মত দিবেন সেটা মেনে নিবেন।

শাইখ জাওয়াহিরী নির্দেশ দেন যে, আইসিস যেন ইরাকে ফিরে যায়, আর তিনি আইসিস সদস্যদের হত্যা করার বিরোধিতা করেন, তাদেরও এর প্রতিশোধ নেয়ার বিরোধিতা করেন। কারণ একে তো মুসলিমরা নিজেরা রক্তা-রক্তিতে লিপ্ত হয়েছে, তার উপর এটা গেরিলা যুদ্ধের নীতি বিরোধী যে, মূল যুদ্ধ ছেড়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়ানো।

কিন্তু আইসিস উল্টো শাইখ জাওয়াহিরী নির্দেশ না মেনে দাবী করে যে, তারা তার নির্দেশ মানতে বাধ্য না। কারণ তারা হচ্ছে "স্টেট" আর স্টেট কখনো কোনো দলের আমীরের কথা মনাতে বাধ্য নয়। তার উপর শাইখ জাওয়াহিরী ইরাকে ফিরে যেতে বলার মাধ্যমে কাফিরদের বানানো বর্ডারকে মেনে নিতে বলছেন। এটা তো কখনোই মেনে নেয়া যায় না।

দেখেন তাদের হঠকারিতা। কারণ সিরিয়ার জিহাদ সকল মুজাহিদ স্টেক হোল্ডারদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই তারা তাদের আমীরকে সকল মুক্ত অঞ্চলের আমীর ঘোষণা করতো পারে না।

এর অর্থ হচ্ছে সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, যে আসলে আমীরকে মেনে নিবে না। তার উপর স্টেট ঘোষণার যে ভুল তারা ২০০৬-২০০৭ এ একাবার করেছিল, ঠিক একই ভুল এবার তারা জোর করে সিরিয়াতেও করতে চাচ্ছে। আল-কায়দা কোনভাবেই বারবার একই ভুল মেনে নিতে পারে না।

যখন মুজাহিদরা মুক্ত অঞ্চল রেখে সামনে এগিয়ে যেত, আইসিস পিছন থেকে সেই অঞ্চলগুলো দখল করতো, সেখানে শরীয়াহ কোর্ট বসাতো। আর মুজহিদারা তাদের সেচ্ছাচারিতায় বাধা দিলেই তাদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হতো। এরকম ব্যাক এ্যান্ড ফোর্থ (সামনে-পিছনে) যুদ্ধ চলতে থাকে।

এর মাঝে রাক্কার শহরে একবার আইসিসের বিশাল সংখ্যাল সেনাবহর এসে, শহর পাহাড়ার দায়িত্বে থাকা জাবহাতুন নুসরাহ তথা আল-কায়দার মুজাহিদদের আটক করে, তাদের জবাই করে, লাশের সাথে বেয়াদবী করে। এই জঘণ্য ছবিগুলো দেখার পরপরই মূলত আমরা অনেকে এদের স্বভাবটা বুঝতে পারি।

অন্যদিক থেকে আইসিসও দাবী করতে থাকে যে, তাদের সাথেও অন্যায় হয়েছে, তাদের নারীদের নাকি রেপও করা হয়েছে। মুজাহিদরা আহবান করে, সব কিছুর বিচারের জন্য নিরপেক্ষ কোর্টে বসার জন্য। অথচ আইসিস আর তখন রাজি হয় না। তাদের মতে তারা স্টেট, তাদের কোর্টেই আসতে হবে। অথচ তাদের কোর্টে তাদের লোক, তাদের বিচারক। ঠিক যেমন লীগের নির্বাচনের মত। সব তাদের। কিন্তু মুজাহিদরা এই প্রহসনের শরীয়াহ কোর্টে যেতে রাজি হয় না।

মুজাহিদরা আরেকটা অভিযোগ করতে থাকে যে, আইসিস তাদের তাকফির করে। কিন্তু আইসিস তা অস্বীকার করে। কিন্তু মুজাহিদরা বিভিন্ন প্রমাণ হাজির করতে থাকে যে, এরা শুধু এদের নেতৃত্ব মেনে না নেয়ার কারণে হত্যা করছে না, বরং এরা তাকফির করে হত্যা করছে। যেমন যারা আমেরিকাপন্থী বিদ্রোহী তারা কাফির, মানে বিএনপি টাইপ যারা।

আর তাদের যারা তাকফির করে না, ইসলামিক ফ্রন্ট মানে যারা জা'মাত-হেফজত টাইপ। তারাও কাফির, কারণ তারা ওই কাফিরকে কাফির মনে করে না। আবার এদের কাফির মনে করে না জাবাহাত তথা আল-কায়দা, অর্থাৎ এরা টেকনিক্যালি কাফির!

ইসলামিক ফ্রন্টের বিভিন্ন দলেও আফগান ফেরত মুজাহিদরা ছিল। এর মধ্যে একজন হচ্ছে আবু খালিদ আস-সুরী, তিনি আহরার আশ-শামে ছিলেম, এর আগে আফগানিস্তানে উসামা বিন লাদেন (রহ.)-এর কাছের লোক ছিলেন।

৮০ 'র দশকে সিরিয়ান জিহাদে ছিলেন তাকে হত্যা করা হয়, এবং সিম্পটোম্প বলে যে, আইসিসই করেছে। তারা মুজাহিদদে বড় বড় লীডরাদের গুপ্ত হত্যা শুরু করে, যাদের আমেরিকাও হত্যা করতে পারছিলো না। আর সাধারণ মুজাহিদদের সাথে তো তাদের নৃশংশতা চলমানাই। তখন মুজাহিদরাও বাধ্য হয় তাদের সাথে ফুল স্কেলে যুদ্ধ শুরু কররার। অথচ তারা অনেক ক্ষেত্রে দামাস্কাসের কাছে পৌছে গিয়েছিল। আইসিসের পিছন থেকে এমন ছুরি মারার কারণে বাশার আল-আসাদ যেন কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

শিয়ারা পরাজিত হচ্ছিল কিন্তু
আইসিসের বাড়াবাড়ি সুন্নীদের মধ্যে ফাটল

৮০ 'র দশকে মুজাহিদদের পরাজিত করার জন্য ইরান হাফিজ আল-আসাদকে অনেক সহযোগিতা করেছিল। এমনও শোনা যায় যে, ইখওয়ানের লোকেরা ইরানের খোমেনীর কাছে সাহায্য চেয়েছিল।

সেটার বিপরীতে ইরান তাদের থেকে তথ্য নিয়ে হাফিজ আল-আসাদকে দিয়ে দেয়, সেটা কাজে লাগিয়ে সে মুজাহিদদের উপর ক্র্যাকডাউন চালায়।

এবার যখন মুজাহিদরা বাশার আল-আসাদকে পরাজিত করে ফেলছিল, তখন লেবানন থেকে হিজবুল্লাহ তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে বাশারকে টিকিয়ে রাখতে। এমনকি আফগান-পাকিস্তান থেকেও শিয়া তরুণদের রিক্রুট করে হিজরত করানো হয় সিরিয়ার যুদ্ধের জন্য।

অর্থাৎ সুন্নী বিশ্বের মত পুরো শিয়া বিশ্ব সিরিয়াকে নিজেদের হাতে রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। এবং তাদেরকে সমর্থন করতে থাকে রাশিয়া।

মুসলিম বিশ্বে একটা মজার বিষয় হলো যে, ইহুদী-নাসারদের দালাল বলতে ইজরায়েল-আমেরিকার দালালী কিছু পরিসরে ইউরোপকে বুঝালেও রাশিয়ার দালালীকে তেমন একটা সমানে আনা হয় না।

তো সিরিয়ার যুদ্ধে শিয়ারা মোটা দাগে সুন্নীদের আমেরিকা-ইজরায়েলের দালাল বললেও, সুন্নীরা যে শিয়াদের রাশিয়ার দালাল বলবে, এটা সুন্নীদের মাঝেই তেমন একটা মার্কেট পাচ্ছিল না।

কারণ সুন্নীরা একে তো বিশাল জনগোষ্ঠি আবার নিজেদের মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব আছে। অপরদিকে শিয়ারা সংখ্যায় কম হওয়ার পরও, নিজেদের মধ্যে কমন একটা স্বার্থ বের করতে পেরেছে। তো কোন শিয়াগোষ্ঠি আক্রান্ত হলে সকল শিয়া একসাথে মিলে এর প্রতিরোধ করে।

ইরাকে তারা আমেরিকার ছত্রছায়ায় সুন্নীদের উপর চরম নির্যাতন করছিল, যখন কিনা সুন্নী মুজাহিদরাই আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ছিলো ফুল স্কেলে। এখনো আমেরিকার ঘাটি আছে ইরাকে, সুন্নীরা যুদ্ধ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ শিয়া-মিলিশিয়ারা এখনো ইরাকে শক্তিশালী অবস্থানে আছে, কিন্তু আমেরিকান বেইসে তারা পুতুল-পুতুল হামলা খেলে।

ইরাকে আমেরিকা আর ইরানের স্বার্থ একই ছিল। কিছু শিয়া গোষ্ঠি আমেরিকার বিরুদ্ধে থাকলেও তারা কখনোই আমেরিকার সাথে ফুল স্কেলে লড়াই শুরু করেনি। বরং কিছু হুমকি-ধামকির মধ্যেই রাখতো। আমেরিকাও শিয়াদের এলাকায় কোন অভিযান চালাতো না। যা ঝড় গেসে, ইরাকের সুন্নীদের উপর দিয়েই গেছে।

কিন্তু সিরিয়াতে আবার আমেরিকা আর ইরানের স্বার্থ বিপরীত মুখী। সিরিয়াতে সুন্নীরাও বাশার আল-আসাদ বিরোধী, আবার আমেরিকাও বিরোধী।

অথচ এক জায়গায় আমেরিকার দালালী করা শিয়ার আরেক জায়গায় এসে খুব আমেরিকা বিরোধী হয়ে যায়, আর সুন্নীদের দলাল বলে প্রচার করে। সুন্নীদের মধ্যে দালাল নেই, তা না আছে।

কিন্তু তারা মূলত আহলুস সুন্নাহর উপর বিদ্বেষের কারণেই এই কাজটা করে। আর এই প্রচারণায় সুন্নীদের অনেক বেকুবরাও সাড়া দেয়। যেমন ভন্ড সুফীরা, সুপ্রিমিস্ট মাজহাবীরা যখন অন্য মাজহাবকে গালি দেয়া হয়, অথচ তারা বুঝতে পারে না যে, যাদের সাথে মিলে গালি দিচ্ছে, তাদের থেকে যাদেকে গালি দিচ্ছে তাদের সাথে তাদের মিল বেশী।

মানে আপনা ভাইয়ের সাথে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে নিজেদের বাপ-দাদার শত্রু এলাকার বদমাইশ নেতা-ফেতার সাথে হাত মিলানোর মতো।

সিরিয়াতে শিয়া-মিলিশিয়াদের নিশৃংস কাজ কর্মের পর ইরান এবং শিয়াদের প্রতি সুন্নীদের যাদের মোহ ছিল, তাদের মোহে ভাটা পড়া শুরু করে। উদাহরণ স্বরূপ, গত দশকে এই অঞ্চলে শিয়া বিষয়ক এত প্রচারণা হয়েছেই শিয়াদের সিরিয়ার কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ।

নতুবা বিএনপি-জামাত আমলে তো ইরান, আহমেদি নেতাদের নাম জপতো এদেশের মিডিয়া।

এই শিয়ারা পরাজিত হচ্ছিল'ই। কিন্তু আইসিসের বাড়াবাড়ি সুন্নীদের মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি করলো। সুন্নী মুজাহিদদের মুক্ত করা বিশাল অঞ্চল আইসিস দখল করে নেয় সিরিয়াতে ২০১৪ এর শুরুতেই। কারো প্রতি কোন দয়া না। বা'য়াত দাও নয়তো যুদ্ধ করো। ওই দিকে মুজাহিরা সমানে থেকে শিয়া পিছন থেকে আইসিস দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছিলো। এরপর এখানে ক্ষমতা একটি শক্তিশালী হবার পর, তারাইরাকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সুন্নী অঞ্চলগুলো দখল করে ফেলে।

এরপর নজর দেয়, কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে। ঠিক এই সময়টাতে আইসিসের নাম মিডিয়াতে আসা শুরু করে।

বলে রাখা ভালো যে, কুর্দিরা মূলত সুন্নী। কিন্তু বাঙালীদের মতো, তাদের মধ্যেও সেক্যুলার বামপন্থী আছে, ইসলামিস্টও আছে। এই কুর্দিদের রাশিয়া-আমেরিকা উভয়ই সাপোর্ট করে। ইরাকের কুর্দি প্রশাসনের স্বায়ত্ত্ব শাসন ছিল, তারা আমেরিকাকে হেল্প করেছে, যেখানে কুর্দি মুজাহিদরা আবার আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়েছে।

ইরাক-সিরিয়ায় কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো হচ্ছে তেল ক্ষেত্রে ভরা। আইসিস কুর্দিদের থেকে তেল ক্ষেত্রগুলো দখল করা শুরু করলো। তখন আমেরিকাও আইসিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া শুরু করলো।

এই সময়টাতে আইসিস ছিল তাদের সক্ষমতার সর্বোচ্চ চূড়ায়। তারা এবার শুধু ইরাক-সিরিয়া নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব থেকে বা'য়াত আহবান করলো। আমাদের এতসব যুদ্ধের একটা বড় গোল তো হচ্ছে খিলাফাহ ফিরিয়ে আনা। তো তারা তাদের আমীরকেই খলিফা ঘোষণা করলো ২০১৪ এর রমজানে।

সারা বিশ্ব থেকে অনেক জিহাদী দল বুঝে না বুঝে এই খিলাফত সমর্থন করা শুরু করলো।

তাদের দাবী তাদের খলিফাকে “আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ” নিয়োগ দিয়েছে। অথচ কারা এই আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ? বরং তাদের নিজেদের লোকেরাই। তারা ভেবেছিল, সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে তারা বাঁকা করবে। করলোও তাই।

হঠাৎ পাওয়া শক্তির চোটে তারা এতই অহংকারী হয়ে উঠলো যে, সবার সাথে শত্রুতা, গায়ে পড়ে যুদ্ধ করা শুরু করলো। যেন জোর করে ক্ষমতা নিয়ে নিবে। নিতে পারলেও হতো।ইয়াজিদ, হাজ্জাজরা নিয়েছিল না পরে যখন উমাইয়ারা স্থিতিশীলতা এনেছিল, তখন সকলেই তাদের খিলাফাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল জালিম।

আইসিসও যদি উমাইয়াদের মত পারত অঞ্চলের পর অঞ্চল দখল করে ইসলাম ও মুসলিমদের হুরমত রক্ষা করতে, তাহলে তারাও হয়ত খিলাফত হিসবে উম্মতের মধ্যে স্বীকৃতি পেতো। কিন্তু তারা সেটা পারেনি।

যতদিন আইসিস মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়ছিলো, আমেরিকা চুপ-চাপ দেখছিল। আইসিস যখন মুজাহিদদের শক্তি একেবারে খর্ব করেনিজেরা তীব্র গতিতে শহরের পর শহর দখল করা শুরু করেছিল, তেল ক্ষেত্রগুলো দখল শুরু করলো, তখনই আইসিসের উপর আমেরিকা এয়ার স্ট্রাইক শুরু করলো।

কারণ এতদিন আইসিসের কাজ আমেরিকার পক্ষেই যাচ্ছিল, তারা বড় বড় মুজাহিদ নেতাদের হত্যা করছিল। এখন যখন তাদের মিত্র কুর্দি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আইসিসের লড়াই শুরু হলো, তখন আমেরিকাও আইসিসকে তীব্র নিন্দা জানিয়ে মিডিয়াতে শোরগোল শুরু করলো।

আর আপনারা সেই সুবাদে আইসিস (ISIS) কত খারাপ, তা জানতে পেরেছেন।

এখানে তুর্কি আবার কুর্দি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে,আইসিসও বিরুদ্ধে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তুর্কি আর আইসিস একমত। তুর্কি বরং আইসিসের কুর্দিদের উপর আগ্রাসন সমর্থনই করছিল। কিন্তু অন্যান মুজাহিদদের সাথে সংঘর্ষে তুর্কি আইসিসের পক্ষে ছিল না, মুজাহিদদের পক্ষে ছিল।

কিন্তু আমেরিকা যখন কুর্দি বিদ্রোহীদের আইসিসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা শুরু করে আইসিসকে হটিয়ে দিল, তখন তুর্কি সুন্নী মুজাহিদদের বললো এই কুর্দিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, এবং তারা তাই শুরু করলো। কিন্তু আল-কায়দা তুর্কির এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিল না।

কুর্দি বিদ্রোহীরা আমাদের শত্রু এটা সত্য। কিন্তু সিরিয়ার মুজাহিদরা বাশার আল-আসাদের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার বদলে তুর্কির শত্রু কুর্দিদের বিরুদ্ধে লড়ার অর্থ হচ্ছে আরেকটা পার্শ্বীয় যুদ্ধে জড়ানো। অর্থাৎ আইসিস যেই ভুলটা করেছিল স্ট্র্যাটিজক দিক থেকে, অন্যান্য সুন্নী মুজাহিদরাও একই ভুলই করছে। এটা নিয়ে আল-কায়দা এবং অন্যান্য গ্রুপগুলোর মধ্যে ব্যাপক টেনশন শুরু হয়।

আইসিসের আগ্রাসনের পরও ইদলিব, আলেপ্পো সহ আরো কিছু অঞ্চলে সুন্নী মুজাহিদদের শক্ত অবস্থান ছিল। আমেরিকা আইসিসের উপর হামলা শুরু করার পর। রাশিয়াও এইদিকে মুজাহিদদের উপর হামলা শুরু করে।

আবার কখনো কখনো রাশিয়া আইসিসের উপর কিছু হামলা করে, আমেরিকাও মুজাহিদদের উপর কিছু হামলা করে। তখন সুন্নী মুজাহিদ গ্রুপ গুলো আল-কায়দার উপর প্রশ্ন তোলে যে তাদের কারণেই আমেরিকা -রাশিয়া এসে তাদের উপর এয়ার স্ট্রাইক করছে।

প্রচন্ড চাপের মুখে জাবাহতুন নুসরাহ আল-কায়দার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেলে।

এদিকে রাশিয়া-ইরানের সাপোর্টে বাশার আবার শক্তিশালী হতে থাকে। সৌদী ব্যাকড দলগুলো আত্মসমর্পন করে। মূলত এই পর্যায়ে এসে আমেরিকা বাশারের সাথে একটা ডিলে আসে যে, আমেরিকা বাশারকে ফালানোর আর চেষ্টা করবে না।

সেই অনুযায়ী আমেরিকার দালাল রাষ্ট্রগুলো তাদের সমর্থন সরিয়ে নেয়। আর ওইদিকে এরদোগান আরেক গেইম খেলা শুরু করে।

সুন্নী মুজাহিদদের উপর আল-কায়দার যে প্রভাব তৈরী হচ্ছিল সেটা নস্যাৎ করতে সে, আল-কায়দাকে সিরিয়া থেকে বের করার উদ্যোগ নেয়। তুর্কি থেকে আমেরিকান বেইসগুলো থেকে ফাইটার, ড্রোন উড়ে এসে আল-কায়দার কমান্ডারদের হত্যা করতে থাকে।

এরদোগান আলেপ্প, হামা, হোমস এসব অঞ্চল বাশারের হাতে তুলে দেয়। তার গেইমটা হলো যে, সে মুজাহিদদের ততটুকু সমর্থন করে, যতটুকু করলে তারা টিকে থাকে, কিন্তু ততটুকু সমর্থন করে না, যা করলে তারা জিতে যায়। এরকম করে যেন, মুজাহিদদের নিজের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়।

তুর্কি যদি এন্টি এয়ার মিসাইল দিতো, তাহলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে রাশিয়া কিংবা আমেরিকার বেগ পেতে কষ্ট হতো, কিন্তু তুর্কি তা দেয়নি। এখন মুজাহিদরা এত এত ভূমি মুক্ত করার পরও শুধু ইদলিবে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আর তুর্কির কথায় উঠতে বসতে হয়।

জিহাদ ইস্তিমিত হয়ে গেছে, কিন্তু সময়ে সময়ে শিয়া-রাশিয়াদের আক্রমণ ঠিকই চলে। কিন্তু তুর্কির প্রতি নির্ভশীলতা এর জবাব দিতে দেয় না। এবং এসব থেকে বের হয়ে আসতে চাওয়ার কারণে আল-কায়দাপন্থীদের চরম নির্যাতনের মুখে পড়তে হচ্ছে।

ওইদিকে আইসিসের এলাকাগুলোতে তো তাদের কোন এয়ার ডিফেন্স নেই। আমেরিকা শহরের পর শহর শুধু বম্বিং করেই মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। সেই এলাকাগুলো এখন কুর্দি বিদ্রোহীদের দখলে। রাজনৈতিক বিজয়, চুক্তি ছাড়া এভাবে প্রকাশ্যে চলে আসলে এমনই হবার কথা ছিল, এমনটাই হয়েছে।

আইসিসের বাড়াবাড়ি তাকফিরনীতি আল-কায়দার মধ্যমপন্থা

আইসিস যে সময়টুকুতে ক্ষমতায় ছিল, তারা এমন কি কি করেছিল যে, জনগণ তাদের সমর্থন করেনি? এর বড় একটা কারণ হলো, তারা স্থানীয়দের সমর্থনের তোয়াক্কা করতো না। তারা ভাবতো, তারা যেহেতু হক্ক, তো বাতিলের সাথে যে কোন প্রকারের সমঝোতাই হচ্ছে দ্বীন বিরোধি কাজ। আর তখন এত অর্থ-সম্পদ আর শক্তি ছিল যে, তাদের আর অন্যদের সাথে সমঝোতা করার মন মানসিকতা ছিল না।

তারা যে বিভিন্ন জায়গায় কোর্ট বসাতো, সেখানেও তাদের নিজদের লোক। প্রশাসক নিজেদের লোক, বিদেশী লোক। এই যেমন ধরুণ সিরিয়ার কোন গ্রামে ইরাকের কাউকে নিয়োগ দিলো, এমনকি একেবারে ভিন্ন জাতির কাউকে। এগুলো স্থানীয়রা কখনোই ভালো চোখে দেখতো না।

আফগানে আল-কায়দা কখনোই প্রশাসক তো দূরের কথা, বিচারকও সাজতে যায়নি। এমনকি আফগান মুজাহিদরা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের সময় শাইখ উসামা বিন লাদেনকে ডাকতো মধ্যস্থতার জন্য। তিনি সর্বদা এসব এড়িয়ে চলতেন। এটা হচ্ছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রজ্ঞা।

এরপরও কিন্তু আফগানের একটা অংশ আল-কায়দার উপস্থিতি পছন্দ করতো না। শাইখ আযযাম তো হানাফী ফিক্বহ অনুযায়ী নামাজ পড়তে বলেছিলেন যেন এগুলো নিয়ে মুনাফিক এবং তাদের ধোঁকায় পড়া লোকরা কোন কোন্দল তৈরী করতে না পারে।

এমনকি এখনো আল-কায়দার যেসব লোকজন ইমারাহ'র বিভিন্ন পোস্টে আছে, তারা সকলেই স্থানীয়। আল-কায়দার কোন মুহাজির সদস্য অফিশিয়ালি ইমারতের কোন পোস্টে নেই। যারা আছে তারা সকলেই স্থানীয় সদস্য।

আল-কায়দা ভারতীয় উপমহাদেশ শাখাও ভারতীয়, পাকিস্তানী এদের দিয়েই তৈরী করেছে। অন্যান্য জায়গার জন্যও আল-কায়দার একই পলিসি। এটা এজন্য নয় যে, আল-কায়দা কাফিরদের তৈরী বর্ডারকে স্বীকৃতি দেয়। বরং এই জন্য যে, যেন স্থানীয়দের সাথে কো-অপারেট করা যায়, কোন ভুল বুঝা-বুঝি কোন্দল তৈরী না হয়।

আইসিসের আরেকটা সমস্যা ছিল যে, তারা তেল খুব পছন্দ করে। যারা তেল মারতে পারে তারাই ভালো পদ পায়। এটা শুধু আইসিসের একার সমস্যা বললে ভুল হবে, এটা আমাদের সবার সমস্যা। তবে আইসিস এমন একটা পর্যায়ে ছিল, তখন এরকম দোষগুলোও কখনো কখনো অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে পড়ে।

এই সমস্যা তাদের ইরাক থেকেই ছিল। সিরিয়াতেও চালু করতে থাকে। খিলাফাত ঘোষণার পরও তারা স্বীকার করছিল না যে তারা তাকফির করে বাকি মুজাহিদদের। বরং তাদের সমর্থকরা এই যুদ্ধকে আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) এর যুদ্ধের সাথে তুলনা করছিলো। এমনকি যেই রাক্কায় তারা আল-কায়দার মুজাহিদদের জবাই করছিল, সেই রক্কার সিফফিনেই আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) এর মাঝে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল।

কিন্তু আইসিস আর আল-কায়দাসহ অন্যান্য মুজাহিদদের মাঝে এই যুদ্ধ কখনোই আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) এর মত ছিল না। কারণ তারা একে অপরকে তাকফির করতেন না। বরং তাদের উভয়কেই তাকফির করতো খারিজীরা, ঠিক যেমনটা আইসিস, আল-কায়দা এবং আল-কায়দা না এমন মুজাহিদ সকলকেই তাকফির করে।এই তাকফির করার বিষয়টা তাদের বিভিন্ন বার্তায় ফুটে উঠতে থাকে।

তাদের কথা ছিল এমন যে কেউ তাদের খিলাফত মেনে নিবে না, তারাইসলামের শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে। অথচ দিন শেষে কাফিরদের বিরুদ্ধেই নিজেদের টিকাতে পারলো না। তাদের খিলাফত যদি সঠিকও হতো, তবুও সেটা মেনে না নেয়াটা কখনোই কাফির হওয়া কিংবা ইসলামের সাথে শত্রুতা না।

সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ভুল হতে পারে। যেমনটা মুয়াবিয়া (রা.), আলী (রা.) এর খিলাফত মেনে নেননি, সেটা রাজনৈতিক ভুল ছিল। এর কারণে কেউ কাফির তো দূরের কথা, আহলুস সুন্নাহ থেকেও বের হয়ে যায় না।

কিন্তু তারা এমনটাই মনে করতো, এরপর তাদেরকে যারা বা'য়াত দেয়নি, তাদের যারা বিরোধিতা করে, তাদের বিভিন্ন দোষ কখনো আসলেই কুফর, কখনো কবীরা গুনাহ এমনকি কখনো কখনো তাদের ভালো কাজের জন্যও তারা তাকফির করতো।

এখন যেমন তাদের দাওয়াতের মূল ফোকাসই হলো, যেসব তরুণরা অলরেডি জিহাদের প্রতি মোটিভেটেড তাদেরকে টার্গেট করে অন্যান্য জিহাদী দলের বিরুদ্ধে চোগলখোরী করে তাদের মন বিষিয়ে তোলা, আর নিজেদের দলে ভিড়ানো। তারপর কোন একটাকে দিয়ে আবেগে চোটে কোনো একটা হামলা করিয়ে দায় স্বীকার করা। তাদের কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক কোন ফ্রন্ট নেই।

অনেক সময় দেখা যায় যে, তাদের স্থানীয় সমর্থকগুলা তাদের ইরাক-সিরিয়ার মূল লোকদের থেকেও বেশী উগ্র। যেমন এই দেশের একটার সাথে কথায় কথায় বলছিল। মাওলানা আতিকুল্লাহ এত খিলাফত সমর্থন করে কি হবে, তারা তো আক্বীদাই ঠিক নেই।

অথচ মাওলানার আতিকুল্লাহ দাঈশের পক্ষে কতদিন সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছিলো একটা সময়। সালাফী সুপ্রিমিস্টরা দাঈশের প্রতি একটু নরম থাকে এটা সত্য এইজন্য তারা তাদের সমর্থন দিয়েছিল, অনেকে এদের আসল চরিত্র না জেনেই।

এদের আরেকটা সমস্যা হলো এদের সবাই নেতা। হঠাৎ ইসলাম বুঝা শুরু করেছে। একটু আক্বীদা শিখেছে ব্যস। এক একজন বড় শাইখ। দাওয়াত দেয়া অবশ্যই ভালো।

কিন্তু আমরা অনেক সময় শতয়ানের ধোঁকায় অহংকারে পড়ি, আমাদের মধ্যে যাদেরকে আমরা "জাহিল" বলছি, তাদের জন্য দরদটা আর কাজ করে না।

এটা শুধু আইসিসের ক্ষেত্রে না, বাকিদের জন্যও সত্য। কিন্তু আইসিসে এরকম রক্তগরম তরুণরা বেশী সুবিধা পায়। কারণ এদের ভক্তরাও এদের তেল মারা শুরু করে, এরা ভাবে যে মুই কি হনুরে! আমি তো আক্বীদায় ইমাম নববী কিংবা ইমাম ইবনু হাজার আসকালানীর চাইতেও বেশী বুঝে ফেলেছি।

আমরা ব্যাখ্যাই ইমাম ইবনু তাইমিয়ার আক্বীদার একমাত্র ব্যাখ্যা, আমিই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের যোগ্য উত্তরসুরী। হ্যাঁ কেউ কেউ সত্য তা হতেই পারে। কিন্তু সেটার সার্টিফিকেট সে নিজ থেকে নিজেকে দিলে তো হবে না, এরকম যোগ্য কারো সনদ লাগবে, আবার সনদ দাতারও তেমন সনদ লাগবে।

আমি বার্ন আউট সালাফীদের মত বার্ন আউট আইসিস অনেক দেখেছি। ব্রিটিশ বাঙালী মেয়েটার কথাই ধরুণ, যে এখন কুর্দি বিদ্রোহীদের কাছে আশ্রিত-বন্দী। কিন্তু তারা দ্বীনের বুঝ পরিপূর্ণ হবার আগেই সে হিজরত করেছে, কষ্ট করেছে কিন্তু যথেষ্ট ইলম ছিল না।

এখন এমন পরীক্ষায় যে, নিজের লেবাসটাও আর ইসলামী রাখতে পারছে না। বাড়ি ফেরার জন্য হলেও ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরছে। শুধু সে না, পশ্চিমের অনেক রিভার্টেড মেয়েদের এই অবস্থা। আইসিসের লোকেরা এদের নিয়ে এসেছে, এরাও আবেগে ঝাপ দিয়েছে, এখন তারা মনবেতর জীবন-যাপন করছে কুর্দিদের কারাগারে।

আমি বলছি না, ফিক্বহী ভাবে এমন হিজরত করা জায়িজ না। কিন্তু আইসিস যেভাবে এদের ডেকে আনলো, যেভাবে এদের অনেককে নেতৃত্বের আসনে বসালো।

এগুলো ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা, প্রজ্ঞার অভাবই প্রমাণ করে। তাদের লোকদের অবস্থা বাপ-মা ছাড়া এতিমের মত। যে যেভাবে পারছে ইউস করতে। তেল মারলেই যেহেতু গলে যায়, এদেরকে গোয়েন্দ সংস্থাগুলোও ম্যানুপুলেট করতে পারছে, যা আমরা আফগানে এদের ধরাপড়া সদস্যদের স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারি।

এরা কথায় অনেক আদর্শবাদী হলেও, বাস্তবে এরা ততটা আদর্শবাদী না। এরা খুব সহজেই ভেঙে পড়ে, এদের ধৈর্য শক্তি কম। সবকাজে তাড়াহুড়ো করারা চেষ্ট করে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এদের মধ্যে উম্মাহর জন্য

দরদটা আমি দেখি নি। একটা রক্তপিপাসু জেদ এদের মধ্যে কাজ করে। আইসিস না এরকম অনেকের মধ্যেও এই বিষয়টা আছে, হতে পারে এরা নেক্সট আইসিস হবে, আল্লাহ না করুক।

এরা চুক্তি করাকে অবৈধ মনে করে। আপনি সব ফ্রন্টে সর্বদা যুদ্ধ করার জন্য সামর্থবান নাও হতে পারেন। তাই কোন কোন শত্রুর সাথে চুক্তি করে, তাদের সাথে যুদ্ধবিরতিতে যাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ না। চুক্তির সীমারেখাগুলো নিয়ে ফক্বীহ'রা বিস্তর আলোচনা করেছেন।

সকল শত্রুর মধ্যে আমেরিকাকে বেছে নেয়ার একটা কারণ ছিল, সব ফ্রন্টে আমাদের যুদ্ধ করারা সামর্থ নেই। তাই সীমতি সামর্থ্যে সবচাইতে বড় শত্রুটাকে দুর্বল করার জন্য আল-কায়দা আমেরিকাকে প্রথমে সাপের মাথা হিসেবে টার্গেট করেছিল।

চীনও আমাদের অনেক বড় শত্রু। কিন্তু চীনের বিরুদ্ধে এখনোই কোন বড় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না, কারণ আগে আমেরিকার মত শত্রুগুলো প্রভাব-প্রতিপত্তি মুসলিম বিশ্বে খতম হোক। এভাবে শিয়াদের ক্ষেত্রেও। তারা তো উম্মতের মুনাফিক।

আইসিস চায় তারা যেভাবে শিয়াদের ক্ষেত্রে আচরণ করে, বাকিদেরও সেভাবে আচরণ করতে হবে, নতুবা তারাও শিয়াদের বন্ধু হিসেবই বিবেচিত হবে। যেমন ইমারাহ শিয়াদের, কিংবা সেক্যুলারদের, গণতান্ত্রিকদের বিভিন্ন স্তররের মুনাফিক হিসেবে ট্রিট করে।

নবীজী (صلى الله عليه وسلم) ঠিক যে কারণে মদীনার মুনাফিকদের সরাসরি তাকফির করে মৃত্যুদন্ড দেননি, ঠিক সে কারণেই ইমারাহ শিয়া কিংবা সেক্যুলারদের সরাসরি তাকফির করে মৃত্যুদন্ড দেয় না। বরং তাদের মুনাফিক এবং জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরেরই মনে করে। তবে হয়ত এদের বিভিন্ন প্রকারের মু-নাফিকদের বিভিন্ন স্তর আছে।

ইসলামে মুরতাদ-মুনাফিক দুইটা টার্মই আছে। এজন্যই আছে যে, এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন যেন এমনভাবে ম্যানুভার করতে পারে, যেন তাদের আক্বীদাও নষ্ট না হয় - আবার রাজনৈতিক স্বার্থও বলবৎ থাকে। যেমন বিদ্রোহের দানা বাঁধতে না দেয়া ইত্যাদি। শিয়া কিংবা সেক্যুলাররা অস্ত্র না ধরলে তাদেরকেও বাঁচতে দিবে ইমারাহ। তবে তাদের সাথে ইলমী লড়াই চলবে। তাদের উপর রিদ্দার হদ কায়েম করতে হলে, স্বতন্ত্রভাবে আদালতে তাদের ব্যক্তিগত রিদ্দা প্রমাণ করতে হবে।

এমনিতে প্রকাশ্যে সকল রকম কুফর-শিরকের বিরুদ্ধে খিলাফতকে নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে। গণহত্যার হুকুম খিলাফত আসলে দিতে পারে না, যদি না তারা নিজেরাই অস্ত্র না ধরে বিদ্রোহ করে।

কিন্তু আইসিস সহ আরো অনেকের ধারণা এমন যে, একবার ক্ষমতা পাইয়া নেই, শিয়া, সেক্যুলারদের একেবারে গণহারে হত্যা করা হবে। বিষয়টা এমন না। ইমারাহ এমনটা করছে না, করবেও না।

আইসিসের আক্বীদাগত ভুলত্রুটি

এতক্ষণ যাবত আইসিসের কৌশলগত ভুলের কথা বেশী আলোচনা করা হয়েছে, এখন আক্বীদাগত ভুলের কথা শুরু করা যাক। আল-কায়দা কৌশলগত ভুল করা দলগুলোর সাথে কাজ করতে আগ্রহী, কারণ কৌশল পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু কারো আক্বীদাগত ভুল তা যদি হয় উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর আল-কায়দা চাইলেও আসলে তাদের সাথে মিলে কাজ করা সম্ভব নয়।

যেমন আইএস এবং শিয়া-রাফিযীরা। অনেক সময়ই এদের সাথে ইমারাহ এবং আল-কায়দার স্বার্থ মিলে যাবে তখন এদের কোন ক্ষতি চাইবে না আল-কায়দা। কিন্তু যখন স্বার্থ এবং দ্বন্দ্ব থাকবে, এদের বাঁচাতে আল-কায়দা শ্রম নষ্টও করতে চাইবে না।

আইএসের যে আক্বীদাগত ত্রুটি, সেটা আইএস থেকে শুরু হয়নি, বরং আরো আগে থেকেই ছিল। যেমন আলজেরিয়ার জিআইএ তাদের কাছে আল-কায়দা পাঠানো প্রতিনিধিদের তারা কারাবন্দী পর্যন্ত করে রাখে। এমনকি তারা আল-কায়দা কাজ শিথিলতা বলে তখন থেকেই পছন্দ করতো না। কিন্তু নয়-এগারোর (9/11) পর আল-কায়দা একটা বড় প্লাটফর্ম হয়ে দাড়ায়। সকল ধরণের জিহাদীরাই চেষ্টা করতে থাকে এটির সাথে নিজেদের সংযুক্ত করতে।

কিন্তু যখনই তারা নিজেদের একটা অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হয়, তারা নিজেদের আসল রঙ দেখানো শুরু করে।

মধ্যমপন্থার দুইদিকে দুইটা বিপথগামী জিহাদী ধারা আছে। একটা হচ্ছে যারা তাগুতদের সাথে লিয়াজু করে জিহাদ করতে চায়, হ্যাঁ তাদের কিছু যৌক্তিক দাবি আছে ঠিকই। কিন্তু বেশীরভাগ সময়ই তারা তা চলমান রাখতে না পেরে তাগুতের প্রক্সিতে পরিণত হয়।

অপরদিকে সকলকে একত্রে শত্রু বানানোর নীতি থেকে চেইন তাকফিরের ফিতনার কারণে জিহাদী দলগুলো খারিজী হয়ে যায়।

আইএস হলো এমনই একটা খারিজী দল যারা চেইন তাকফিরকে তাদের একটা অস্ত্রে পরিণত করেছিল প্রতিযোগী মুসলিম-গোষ্ঠিগুলোকে পরাজিত করার জন্য। আইএস অন্যান্য ইসলামপন্থীদের তাকফির করার কারণ হলো সদস্য-সমর্থকদের চোখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বৈধতা দান করার জন্য নিজেদের একমাত্র বৈধ মুসলিম শক্তি প্রমাণ করার জন্য।

অনেকে ক্লাসিকাল (সর্বোৎকৃষ্ট) খারিজীদের সাথে আইএসের কিছু মিল অমিলের তুলনা দিয়ে তাদের খারিজী প্রমাণের চেষ্টা করে, আবার অনেকে তা থেকে তাদের খারিজী না প্রমাণের চেষ্টা করে। এর বড় একটা উদাহরণ হলো, ক্ল্যাসিকাল খারিজীরা কবীরা গুনাহর কারণে তাকফির করতো।

বাস্তবতা হচ্ছে ক্লাসিকাল খারিজীরাও কিছু কবীরা গুনাহর কারণে তাকফির করতো, কখনো কখনো গুনাহ না উল্টা ভালো কাজের জন্যও তাকফির করতো। যেমন আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়ে সালিস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিশ্চয়ই ভালো কাজ করেছিলেন। কিন্তু খারিজীদের চোখে তা শুধু খারাপই নয়, বরং কুফর ছিল।

পরবর্তীতে খারিজীদের ঈমান-কুফরের সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে কবীরা গুনাহর কারণে তাকফির করার চর্চা শুরু করেছে। কিন্তু শুরুরতে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন ভালো কাজের কারণেও তাকফির করেছে।

এর বিপরীতে আইএসের লোকেরা অনেক রকম কবীরা গুনাহর উদাহরণ দিয়ে দাবী করে যে, তারা তো এগুলোর জন্য তাকফির করে না। যেমন তারা বলবে, কেউ জিনা করলেই তো আইসিস তাদের তাকফির করে না, কিংবা অন্য কোন কবীরা গুনাহর জন্য তো তাকফির করে না।

তাহলে তারা কিভাবে খারিজী? বাস্তবতা হলো, তারা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন ভালো কাজের জন্যও তাকফির করে। এবং তাদের পছন্দ নয় এরকম খারাপ কাজের জন্যও তাকফির করে। কাফিরদের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি এবং সাধ্যমত মজলুম মুসলিমদের সাহায্য না করার জন্যও তারা তাকফির করে। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পান থেকে চুন খসলেই সেটা দিয়ে তারা তাকফির করে, জরুরী না সেটা কবীরা গুনাহ।

যেমন সিরিয়াতে আল-কায়দা একবার সেক্যুলার একটি দল থেকে বা'য়াত নিয়েছিল। মানে সেক্যুলার দলটি আল-কায়দার অনুগত্য করবে, তো এটা কি খারাপ কাজ? একটা সেক্যুলার দল শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, এমন দলের অনুগত হলে সেটা তো সাধুবাদ জানানোর যোগ্য।

কিন্তু আইএস এই বা'য়াত নেয়ার জন্যই আল-কায়দার ওই দলটাকে তাকফির করেছিল, তারা নাকি কাফির সেক্যুলারদের সাথে মিলে গেছে। বাস্তবতা হলো যে, আইসিস এফএসের একটা দলকে সাইজ দিতে আসে।

আল-কায়দা গিয়ে তাদের ক্যাম্পে নিজেদের পতাকা তুলে তাদের থেকে বা'য়াত নিয়ে নেয়। আল-কায়দার ধারণা ছিল যে, অন্তত আল-কায়দাকে তাকফির করে তারা হত্যা করবে না, এই সুযোগে এফএসএর কিছু লোক বাঁচলো। অথচ ঘটলো উল্টা ঘটনা।

অর্থাৎ ক্লাসিকাল খারিজীদের সাথে হুবুহু সব বিষয়ে মিলাটা জরুরী না। বরং মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো মিললেই হলো। আর তা হলো, মুসলিমদের অন্যায়ভাবে কাফির আখ্যা দিয়ে হত্যা করা। চেইন তাকফির করা। এগুলোর পরের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মুশরিকদের ছেড়ে দিবে আহলুল ইসলামদের হত্যা করবে।

এখন আইসিস কি কখনোই মুশরিকদের সাথে লড়াই করে না? করে, কিন্তু তাদের মেইন ফোকাস হলো প্রতিপক্ষের মুসলিমদের সাথে লড়াই করা, আগে তাদের শেষ করা। আইসিস শিয়া ও সেক্যুলারদের সাথেও লড়াই করে। তবে এই লড়াইয়ের সূরতটা কেমন হবে, সেটা হলো কৌশলগত পার্থক্য।

এর কারণে তাদেরকে খারিজী বলা হচ্ছে না আল-কায়দার পক্ষ থেকে। বরং তাদের অবৈধ তাকফির এবং এর উপর চেইন তাকফির করে সেই সব মুসলিমদের হত্যা করা, কিংবা হত্যা করা বৈধ মনে করার ভিত্তিতে তাদের তা-খারিজ করা হচ্ছে।

খারিজিয়াত হলো জিহাদী দলগুলোর বাই প্রোডাক্ট। খারিজী এলিমেন্ট আধুনিক জিহাদী দলগুলোতে থাকবেই। শুরুতে তারা বিচ্ছিন্ন আলাদা আলাদা থাকে। ধীরে ধীরে জমা হতে থাকে। ঠিক যেভাবে চিনি পানিতে মেশাতে থাকলে একটা সময় পাত্রের তলায় অতিরিক্ত চিনি জমা হয়।

একটা সময় এটা স্পষ্ট হয় যে, দুইটা আলাদ অস্তিত্ব আছে এখানে। এবং খারিজীরা যখন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে যায়, তারা সেই জিহাদী দল থেকে বের হয়ে যায়।

যখন খারিজীদের শক্তিশালী কোন দল থাকে না। তারা বা এই প্রকারের লোকেরা তখন জিহাদী দলগুলোতে ঢুকতে থাকে। এবং ঢুকতে ঢুকতে যখন অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন প্রথম প্যারায় যা বললাম, সেটার পুনরাবৃত্তি হয়।

আইসিস সমর্থকদের ধরণ এবং ধ্যান-ধারণা

আজকে কথা বলবো আইসিসের সমর্থকদের ধরণ নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই আইসিসের সব সমর্থক সেইম না, তাদের মধ্যেও মতভেদ আছে, উগ্রতার মাত্রা আছে। এই যেমন কেউ কেউ আল-কায়দাকে তাকফির করে না, আবার কেউ কেউ আল-কায়দার বিভিন্ন গ্রুপকে তাকফির করে না। কেউ কেউ জনগণকে তাকফির করে না, আবার কেউ কেউ করে।

কিন্তু তাদের মূলে যারা আছে, তারা মোটামটি সকলকেই তাকফির করে তারা নিজেদের ছাড়া। নেতৃত্ব পর্যায়েও মতভেদ হয়। হাযমী নামক একটা গ্রুপ আইসিসের মধ্যে, তারা তাকফির করতে করতে একটা পর্যায়ে বাগদাদীকেই তাকফির করে। সেই গ্রুপটাকে আইসিস নিজেই খারিজী ফতওয়া দিয়ে সাইজ দেয়।

তারপর বোকো হারামের কথা ধরুন। তাদের মূল অংশটাই আইসিসকে বা'য়াহ দেয়। ছোট একটা অংশ আল-কায়দার সাথে সহমত থাকে।

কিন্তু এই বড় অংশটার নেতা ছিল আবু বকর সেকাউ। বিভিন্ন অদ্ভুত, এবং হাস্যকর কাজের জন্য সে মোটামুটি পরিচিত ছিল। তার অতিরিক্ত তাকফিরের কারণে আইসিসের লোকেরাই তাকে হত্যা করে এবং তারা গ্রুপকে দমায়।

আমি তাদের একজনের সাথে কথা বলেছিলাম যে, কেন আবু বকর সেকাউকে হত্যা করা হলো? তারা জবাব ছিল, সে জনগণকে তাকফির করতো, জনগণের সাথে সীমালঙ্ঘণ করতো। আমার ধারণা সে আইসিসের নেতৃত্ব পর্যায়ের কাউকে হয়ত তাকফির করেছে। এছাড়া সীমালঙ্ঘনের বিষয়টা তো আছেই।

এমনিতে আইসিসের লোকেরা নিজেদের সমর্থকদের পড়ানোর সময় শিখায় যে, তারাও জাহালাতের ওজর দেয়, তাবীলরে ওজর দেয়, জোর-জবরদস্তি উপায়হীনতার ওজর দেয়। কিন্তু বাস্তবে তাদের লোকেরা এটার উপর আমল করে না। বিশেষ করে তাদের প্রতিপক্ষদের বেলায়। তাকফিরকে তারা একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের জান-মাল হালাল করার জন্য।

এমনকি সর্বযুগে নতুন খারিজীরা পূর্বের খারিজীদের খারিজীই মনে করে। যেমন বর্তমান দাঈশ, GIA কে খারিজীই মনে করে। তেমনি আরো ১০-২০ বছর পর যারা খারিজী হবে, তারাও তখন দাঈশকে খারিজীই মনে করবে। এই কথাটা লিখে রাখতে পারেন। এমনকি শাইখ আবু মুসা'আব আস-সুরীও এমন প্যাটার্নের কথা বলে গেছেন।

এখন তারা দুর্বল অবস্থায়, তাই এদের নিষ্ঠুরতা অনেক ক্ষেত্রে বুঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যখনই তারা শক্তি অর্জন করে, তারা নিকটস্থ শত্রুদের সাথে, তথা তাদের ভাষায় মুরতাদদের সাথে সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে।

কারণ তাদের মতে মুরতাদদের কুফর-কাফির আসলির চেয়েও বেশী আর কুরআনে নিকটস্থ কাফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনেকে আল-কায়দার ব্যাপারে অভিযোগ করে, আল-কায়দা নিকস্থ কাফিরের বদলে দূরবর্তী কাফির তথা আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করে কুরআনের আয়াতের বিপরীত কাজ করছে। বিষয়টা আসলে তা নয়। আল-কায়দা নিকটস্থা মুরতাদদের গডফাদার তথা আমেরিকাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল যেন এই নিকটস্থ শত্রুরা দুর্বল হয়ে যায়। অর্থাৎ নিকটস্থ কাফিরদের সাথে যুদ্ধের অংশই হচ্ছে গ্লোবাল জিহাদ।

অনেক লোকাল জিহাদী গ্রুপগুলোর সাথেও এই ব্যাপারে আল-কায়দার দ্বিমত আছে। যেমন সিরিয়ার কিছু জিহাদী দলগুলো মনে করে আল-কায়দার সাথে আমেরিকার শত্রুতা লোকাল জিহাদকে বাধাগ্রস্ত করছে। যদি আমেরিকার সাথে শত্রুতা না থাকতো, তাহলে আমেরিকা সিরিয়ার জিহাদীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতো না।

আর জিহাদীরা শিয়াদের সাথে আমেরিকার বাঁধা ছাড়াই যুদ্ধ করতে পারতো। এই একটা যুক্তিতে সিরিয়ান জিহাদের আল-কায়দা তার অবস্থান হারিয়েছে। আল-কায়দা কোনভাবেই আমেরিকার সাথে বৈঠক করতে রাজি না। আর তাদের দোহাই দিয়ে আমেরিকাও এয়ার স্ট্রাইক করার অজুহাত পেয়ে যায়।

কাশ্মিরের ক্ষেত্রেও আল-কায়দার সাথে স্থানীয়দের দ্বিমতের জায়গাটা ছিল, আল-কায়দার লক্ষ্য তো আমেরিকার পতন, কিন্তু কাশ্মীরিদের তো ভারতকে নিয়ে বেশী চিন্তা। তাহলে এ দুইটার সমন্বয় কি? সমন্বয় হলো, আন্তার্জাতিক সাপের মাথা আমেরিকার কিছু প্রাদেশিক মিত্র আছে যারা মুসলিমদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, তাদের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ গ্লোবাল জিহাদের বাহিরে নয়।

যেমন পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দুনিয়াদারিতা, ট্রেচারীর কারণে কাশ্মিমীরী জিহাদীরাও পাকিস্তানের বদলে আল-কায়দার দিকেই ঝুকে পড়ছে। হামাসের সাথেও আল-কায়দার একটা মতপার্থক্যের জায়গা ছিল আমেরিকার সাথে সম্পর্ক নিয়ে। হামাস ইজরায়েলের মধ্যেই শত্রুতা সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল, আমেরিকা কিংবা ইউরোপকে শত্রু বানাতে চায়নি।

আল-কায়দার কথা ছিল, এরাই ইজরায়েলকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছে, এদের পতন হলে ইজরায়েলেরও পতন হবে। কিন্তু ইজরায়েলের প্রতি এদের নগ্ন সমর্থন কিন্তু হামাসের সাথে এদের কোন সম্পর্ক আর গড়ে উঠে নি।

হামাস বা ইখওয়ানীদের একটা নীতি হলো, তারা আমেরিকান জনগণকে পাশে চায়, কাফিরদের জনগণকে পাশে চায়। তাই তাদের ক্ষতি হোক এমন কোন কাজ তারা করে না। কিন্তু আল-কায়দা এই পদ্ধতির বিরোধী ছিল। আল-কায়দার মতে, তাদের জনগণ আসলে তেমন একটা কেয়ার করে না যে বিশ্বের এ প্রান্তে তাদের সরকারগুলো কি রকমের জুলুম করছে।

নয়-এগারোর (৯/১১) আগে আসলেও তাদের পাত্তা ছিল না। কিন্তু ইরাক-আফগান যুদ্ধের পর তাদের জনগণের একটু চোখ খোলা শুরু করে। এবার ৮ অক্টবরের পর তারা আরো বেশী তাদের সরকারগুলোর মানবতাবিরোধী কাজগুলোর ব্যাপারে অবগত হয়।

কিন্তু এরপরও তারা কি তাদের সরকারগুলোকে তাদের সংজ্ঞা মতই এই মানবতা বিরোধী কাজ থেকে থামাতে পারছে?

তাই আল-কায়দার পলিসি হচ্ছে, কাফিরদের জনগণ আমাদের পক্ষে থাকলে অবশ্যই ভালো। কিন্তু তাদের জনগণকে খুশি রাখতে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক কোন ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।

হামাসও অনেক চেষ্টা করেছে রাজনৈতিক ভাবে ইজরায়েল-আমেরিকার সাথে ডিল করতে। কিন্তু তারা পাত্তাই পায় নি। একটা পর্যায়ে তারা টু-স্টেট সলিউশনও (দ্বৈত রাষ্ট্র) মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের জিহাদের পথেই আসলে ফিরে আসতে হলো।

আর এই জিহাদের কারণে কাফির জনগণের টনক যা নড়ার একটু নড়েছে। আল-কায়দা হয়ত হামাসের সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পক্ষে না, কিন্তু রাজনীতির মাঠে যাওয়ার বিরুদ্ধেও না আল-কায়দা। বরং আল-কায়দা রাজনীতি করতেই বলে। এখন রাজনীতি, কূটনীতির মাঠে অনেক সময় অনেক অপছন্দনীয় কাজ দেখতে পাবেন।

হারামের পর্যায়েও কাজ হয়ত দেখবেন। তখন বুঝতে হবে আমাদের আদর্শ তো কুরআন-সুন্নাহ, আমরা সাহাবাদের পদক্ষেপ, ফলো করবো - এবং এখনকার মানুষদের ভুল হতে পাতে, দোষ হতে পারে স্বীকার করবো, বরং কোন দোষ না থাকলেই সেটা অস্বাভাবিক। কিন্তু আইসিস এই দোষ-ভুলগুলোকে তাকফির করার বিষয়বস্তু বানায়।

যেমন ফিক্বহী ভাবে স্পেন, ফিলিপাইন বিজয় করাও কিন্তু আমাদের জন্য ফরজে আইন হয়ে আছে। সেখানে উইঘুরদের মুক্ত করা তো আরো বড় ফরজ, তাই নয় কি? এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

যারা অস্বীকার করে তারা আহলুস সুন্নাহর ভিতরে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমরা তা করছি না, আমরা কি আমেরিকার পতন করতে হবে, শরীয়াহ-খিলাফাহ কায়েম করতে হবে এগুলো নিয়ে আছি। বাস্তবতা হলো এগুলো ওগুলোরই অংশ।

এগুলো বিজয় করা আমাদের জন্য কাযা হয়ে আছে। তো এগুলো বিজয় করা বিভিন্ন সময় আমেরিকার পতন ঘটানো, শক্তিশালী মুসলিম হুকুমত গঠন করা, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার ধারাবাহিকতায় সেই ভূমিগুলো পুনরায় বিজয় হবে।

আইসিস সহ সব ইসলামী দল এটা স্বীকার করবে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে দমানোর জন্য তারা বেছে বেছে বলবে, এরা তো এই কাজ করে না, করতে বলেও না, তাই তারা বাতিল, তাই তারা কাফির।

এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্যটা বুঝতে হবে। বাতিল তারা যারা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা, মুসলিম ভূমিগুলো প্রতিরোধ এবং পুনঃউদ্ধারের বিরুদ্ধে। এখন এগুলোর পক্ষে থেকেও সাধ্যমত কিংবা প্রত্যাশা আনুযায়ী অনেকে অনেক কাজ করতে পারে না, কিংবা করে না। শুধু এইটুকু বাতিল বলার জন্য যথেষ্ঠ নয়, আর তাকফির করা তো দূরের কথা।

ইমারাহ,আল-কায়দা শিয়াদের ভাই মনে করে, অভিযোগ আইসিসের

আইএসের লোকজনদের অভিযোগ যে, ইমারাহ শিয়াদের ভাই মনে করে, আল-কায়দা ইরানের সাথে বন্ধুত্ব করেছে। তাই তারা কাফির অথবা অন্তত বিভ্রান্ত।

পঠিত পাঠে আলোচনা করা হয়েছিল যে, আল-কায়দা এবং ইমারাহ'র শিয়াদের ব্যাপারে অবস্থান হলো যে, তারা শিয়াদের সাথে ঠিক তেমন আচরণ করবে যেভাবে মদীনার মুনাফিদদের সাথে সাহাবারা আচরণ করতেন। এবং সেই ধারণাই রাখবেন, যেই ধারণা তারা রাখবেন।

এটা সত্য যে মদীনার মুনাফিকরা আর শিয়ারা হুবুহুব এক না, কিন্তু এটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং ইজতিহাদ। শিয়াদের ভাই ডাকা আর তাদের জান্নাতে যাওয়া বিশ্বাস করা একই নয়। এমনকি হামাসের যারা কখনো কখনো শিয়াদের কুখ্যাত লীডারের নিহত হওয়ার পর, তাকে শহীদ সম্বোধন করা, একটা কূটনৈতিক কথাবার্তা যেটা একটা অনুচিত কিংবা হারাম কাজ।

কিন্তু শুধুমাত্র এটার জন্য কুফরের তকমা আরোপ করা যায় না। তেমনি ইমারাহ'র কেউ যদি ইরানকে ইসলামী রিপাবলিক অব ইরান বলে, কিংবা কোন শিয়াকে ভাই ডাকে, জাস্ট এর জন্য কুফরের অভিযোগ আরোপ করা যায় না।

সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায়, এই কূটনীতি করে ইমারাহ'র কিংবা সুন্নীদের অর্জন তেমন কিছু হবে না।

এজন্য ইরান সীমান্তে তালিবানদের কিছু সদস্য ইরানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ লিপ্ত হওয়ার পর, সকল তালিবান প্রস্তুত ছিল যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু লীডারশীপ মাসলাহা-মাফসাদার কারণে ইরানের সাথে সমোঝতা করে নেয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, তারা শিয়াদের ভাই না শত্রুই মনে করে কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ করছে না কৌশলগত কারণে।

এবার আল-কায়দার সাথে ইরানের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, ইরানের মধ্য দিয়ে আল-কায়দার লোকেরা ইরাক পৌছেছিল। সেক্ষেত্রে ইরানের সাথে আল-কায়দার মিত্রতা ছিল কিন্তু একটা স্বার্থের সম্পর্ক ছিল। ইরান অনেক সময় গ্রেফতার করেছে, নযরবন্দী করেছে, অনেক সময় না দেখার ভান করেছে - এটা তাদের নিজেদের স্বার্থেই।

অন্তত পাকিস্তান এতটুকুও করেনি, তারা ধরে ধরে আমেরিকার কাছে বিক্রি করেছে। কিন্তু এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না যে ইরান আর আল-কায়দা একে অপরের মিত্র।

পূর্বেও আইএস এরকম অভিযোগ করায়, একজন আল-কায়দা শাইখ বলেছিলেন,

"তোমরা কাঁচের ঘরে থেকে আরেকজনের কাঁচের ঘরে ঢিল নিক্ষেপ করো না।"

আয-যারকাভী সহ অনেকেই আফগান থেকে ইরান হয়েই ইরাকে পৌছায়, এজন্য ইরানের দালাল হওয়া জরুরী নয়। আল-কায়দা অপারেটররা, স্পাইরা ইরানের বিভিন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড রাস্তা ব্যবহার করেই আফগান থেকে ইরাক সফর করতো। ইরান যেন তাদের উপর চড়াও না হয়।

এজন্য হয়ত ইরানের সাথে আল-কায়দা কোন সংঘর্ষে যেতে রাজি না এটা কেউ চাইলে দাবী করতেই পারে।

কিন্তু গেরিলা যুদ্ধের নিয়মের মধ্যেও পড়ে না যে, যখন আমেরিকাকে প্রধানশত্রু হিসেবে টার্গেট করলাম, তখন আরেকটা শত্রুর সাথে যেচে পড়ে পার্শ্বীয় যুদ্ধ সূচনা করার কোনো অর্থই হয় না। এমনকি সিরিয়ার যুদ্ধও আল-কায়দা শুরু করেনি। তবে ইতিমধ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধকে আল-কায়দা সঠিকপথে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল মাত্র।

এখন আল-কায়দার এই কৌশলগুলোকে আইএসের লোকেরা বলে তারা স্বার্থের সাপেক্ষে যুদ্ধ করে, শরীয়াতের স্বার্থে না। তাদের সাথে অন্যান্য

দুনিয়াপন্থী ইসলামী দলের আসলে কোন পার্থক্য নেই। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, আপনি সব শত্রুকে একসাথে মোকাবেলা করতে পারবেন না দেখেই, গেরিলা পদ্ধতি বেছে নিলেন।

আইএস নিজে তো একসাথে সব শত্রু এমনকি যারা শত্রু না তাদেরকে শত্রু হিসেবে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলো, তারা কি সফল হয়েছিলো? কৌশলকে তারা দ্বীন বিমুখীতর নাম দিয়েছে। এক শত্রুর সাথে চুক্তি করে, আরেক শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের চেষ্টাকে তারা নাম দিয়েছে নিফাক্ব।

যেমন পাকিস্তান আমাদের বড় শত্রু নাকি ইরান? পাকিস্তান সুন্নী হলেও এটা গণতান্ত্রিক এবং আমেরিকার বলয়ে। অন্যদিকে ইরান আমেরিকার বলয়ে না। আইএসের কথা হলো দুইটাকে একসাথে এক কাতারবদ্ধ করতে হবে।

আল-কায়দার কথা হলো না, ইরানকে না ধরে, যেহেতু আমেরিকার কারণে পাকিস্তান আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করছে, তাই আগে পাকিস্তান পর্ব শেষ হোক। পাকিস্তান জয় হলে সুন্নীদের কাছে যেই নিয়ন্ত্রণটা থাকবে, ইরান জয় করে কি শিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে সেই নিয়ন্ত্রণটা থাকবে?

আর জয় করাটা কি এতটা সহজ হবে? কারণ সুন্নী পাকিস্তানে রিক্রুটমেন্ট পাওয়া যাবে, সমর্থন পাওয়া যাবে, কিন্তু শিয়া ইরানে পাওয়া যাবে সমর্থন?

অর্থাৎ ইরান, শিয়ারা সুন্নীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরলে আল-কায়দাও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে রাজি না। কিন্তু যেখানে যেখানে তারা আগ্রাসন চালাচ্ছে, সেখানে মুসলিমদের প্রতিরক্ষা আল-কায়দা বড় ফরজ মনে করে। কৌশলের কারণে তারা সেগুলোকে অস্বীকার করে না, যেমনটা ইমরান নযরপন্থীরা করেছিল।

অনেক সুফী পন্থীরা এমনকি মাদখালীরাও করেছিল। একটা সময় মাদখালীরা সিরিয়ার যুদ্ধের পক্ষে থাকলেও, যখনই সৌদী নিজেদের সরিয়ে নিল, সৌদীপন্থী মুজাহিদ নেতা জাহারান আলুশ শহীদ হলেন রাশিয়ার হামলায় এবং তার ভাই শিয়াদের নিকট সব অস্ত্র সমর্পন করে

আত্মসমর্পণ করলো। তখন থেকে মাদখালীরা সিরিয়ার অবস্থার জন্য শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে দায়ী করলো।

একই ভাবে হানাফী সুফীরা রমজান আল-বুতি শিয়া বাশার আল-আসাদকে সুন্নী ফতওয়া দিয়ে তার পক্ষে থাকায়, তারা এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলো।

অর্থাৎ কৌশল আর ফরজিয়াত কখনো মুখোমুখি হয়ে গেলে আল-কায়দা কৌশলের কারণে ফরজকে অস্বীকার করে না, সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালায়। বরং আইএস নিজেও যখন কৌশল করে, তখন আর তাদের খবর থাকে না।

যেমন মুজাহিদ শিয়া-রাশিয়ার সাথে যখন লড়াইরত, তখন এমনও ঘটেছে, তারা শিয়া বাহিনীগুলোর এলাকা অতিক্রম করেছে, একে অপরেরকে একটা গুলিও করেনি।

অতিক্রম করে সুন্নী মুজাহিদদের এলাকায় এসে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাদের কাছে তো উভয়ই মুরতাদ, তো আল-কায়দা যেমন ইরানকে ফেলে পাকিস্তানকে সাইজ দেয়ার চিন্তা করছে, তারাও বাশার আল-আসাদকে ফেলে সুন্নী মুজাহিদদের সাইজ দেয়ার চিন্তা করেছিল। নিজেরা করলে দোষ নাই, অন্যরা করলেই দোষ!

এমনও ঘটনা ঘটেছে, এক মুজাহিদ দলের গোলাবারুদ সব শেষ। একদিকে শিয়া-মিলিশিয়াগুলোর দখলে, আরেকদিকে আইএসের দখলে। তখন তারা টুইট করছিলো যে, যে কোন একপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এবং কারো কাছেই বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই, একদিকে নুসাইরী-রাফিযী আরেকদিকে দাঈশী-খারিজী!

তারপর ইরানে আল-কায়দার বিভিন্ন নেতা বিশেষ করে সাইফ আল-আদেলকে নিয়েও দাঈশের যে অভিযোগ, তিনি ইরানের দালাল কিনা একথার কোন ভিত্তিই নেই। এজন্য যে, যতটুকু জানি তিনি ইরানে বন্দী ছিলেন। স্বগৃহে বন্দী ছিলেন, এরপর কিছুদিন মুক্ত ছিলেন। এখন কোথায় আছে নিশ্চিত না।

এই সময়টার মাঝে, তিনি সিরিয়াতে ইরানের স্বার্থবিরোধী কাজ করার কথাই বলেছেন আল-কায়দা এবং অন্যান্যা মুজাহিদদের। তিনি ইরানের পাপেট হলে নিশ্চয়াই ইরানের স্বার্থ বিরোধী কথা বলতেন না। তাছাড়া ড. জাওয়াহিরী বেয়াই আল-কায়দার ওয়ান অফ দা টপ লিডার আল-মাসরী এবং তার মেয়েকে হত্যা করে মোসাদ।

মোসাদ হত্যা করলেও, ইরানই যে তথ্য দেয়নি এর তো কোন নিশ্চয়তা নেই। আইএসের লোকেরা নিজেদের পক্ষে গেলে আমেরিকার কথাও বিশ্বাস করে।

আমেরিকার তখনকার মুখোপাত্র মাইখ পাম্পেও বলেছে, আল-কায়দা ইরানের দালাল, তো তার কথায় আইএসের লোকেরাও বলা শুরু করলো, যে আল-কায়দা ইরানের দালাল, কারণ ইরানে তাদের নেতাকে মোসাদ মেরেছে। এ থেকে কি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় কিছু? মোটেই না!

কারণ আল-কায়দা কি? তা আল-কায়দার বার্তা, কাজ থেকে প্রমাণিত হয়। ইরানের সাথে গোপণে যদি কোন চুক্তি হয়েও থাকে সেটা থেকে এটা বলা যায় না যে, তারা দালাল।

এমনকি ইমারাহ'র সাথেও এমন কোন চুক্তি ইরানের হয়নি যে, তারা আইএসের বিরুদ্ধে একসাথে কাজ করবে। কিন্তু আইএসের ব্যাপারটা এত অস্পষ্ট যে, আইএসের নাম দিয়ে কারা কাজ করছে।

এটার নিয়ন্ত্রণ আসলে আইএসের যে খলিফা এবং তার স্থানীয় লীডার তাদের কারো কাছে নেই। এখন মোসাদ (Mossad) কিংবা সিআইএ (CIA) কিংবা র (RAW) কিংবা পাকিস্তানের আইএস আই (ISI,গোয়েন্দা সংস্থা)

যদি কোন অপারেশন করে, সেটা দাঈশের অফিশিয়াল লোকদের কাছে ডকুমেন্টস দিয়ে বলে যে,

আমরা আপনাদের সমর্থক, আপনাদের খলিফাকে বা'য়াত দিয়েছি, তারা সেই অপারেশনের দাবি করে নিবে, এই হলো অবস্থা।

তো এরকম জাতীয়তাবাদী পতাকাতলের আক্রমনগুলো প্রতিরোধের জন্য ইরানের সাথে মিলে ইমারাহ যদি কাজও করে, তাহলে তো সেটাকে নিশ্চিতভাবে কুফর তো দূরের কথা হারামও বলা যাচ্ছে না।

তাকফির বাড়াবাড়ি নয় মধ্যমপন্থা সুশৃঙ্খলবদ্ধ

জনগণের দলকে আল-কায়দা কাফির মনে করে না, যদি না তারা এমন কোন দস্তুর প্রকাশ করে, যেখানে সুস্পষ্ট কুফর-শিরক থাকে। এরপরও আল-কায়দা মাথাগুনে পুরো দলের সকলকে কাফির মনে করে না। তবে দলগতভাবে এটা কুফরের উপর পতিত দল - এবং এরা যদি কাফিরদের সাথে মিলে যুদ্ধ করে তাদের সাথে ঠিক সে আচরণই করা হবে, যে আচরণ কাফিরদের সাথে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে এই প্রকারের লোকদের মধ্যে নিশ্চয়ই কাফির আছে, এবং মুসলিমও আছে যারা দলের টানে কিংবা হুজুগের বসে এরকম কাজে জড়িত হয়েছে। তাই তাদেরকে তাকফীরে মুয়াইয়ান (প্রত্যেককে নির্দিষ্টভাবে কাফের সাব্যস্ত) করতে হলে আসলে আদালত লাগবে, কিংবা অন্তত নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেকের অপরাধ দেখতে হবে যে, তাদের আসল হাকিকত কি।

তবে আলেমরা সাধারণত দলের নেতাদের হালত দেখবেন, তাদের ভ্রান্তি নিরসন করবেন। তারা যদি তাদের কুফর-শিরকে অটল থাকে, তাদের তাকফির করবেন। এরপরও তাদের অনুসারী যদি তাদের সাথে থাকে, তো থাকলোই। তারা মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তাদেরকেও অনুরূপ ফিরিয়ে দিতে কোন বাধা নেই।

কিন্তু এরপরও কথা থেকে যায় যে, আলেমরা যাকে তাকফির করলেন, সেটাও ইজতিহাদের ভিত্তিতে। এখন আলেমদের এই ফতওয়ার সাথে একমত না হওয়ার কারণেই নিশ্চিত ভাবে এই ব্যক্তিকে কাফির বলা যাচ্ছে না। এই কারণে যে, ওই ব্যক্তি কাফির ইজতিহাদের ভিত্তিতে সে কাফির আল-আসলি নয়।

এমনকি তার কাফির হবার ব্যাপারে ইজমাও প্রতিষ্ঠিত না। তাই কাফিরকে কাফির না বলার কারণে, সেও কাফির এই নীতি এখানে ঢালাওভাবে প্রয়োগ হবে না। বরং তাদের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অন্য কুফরী সাব্যাস্ত করতে হবে, নতুবা শুধু এর ভিত্তিতে চেইন তাকফির করা যাবে না।

হতে পারে ওই অনুসারীরা সত্য সত্যই কাফির, কিন্তু তাই বলে উসুলের ভুল প্রয়োগ করা যাবে না। যেই বিশ্বাস কিংবা কাজের কারণে সুস্পষ্টভাবে তাদের রিদ্দা (ধর্ম ত্যাগ) প্রমাণিত হবে, সকল অজুহাত দূর হবে এরকম সূক্ষ্ম কাজ বিদগ্ধ উলামারাই করতে পারেন। এবং খিলাফাহ থাকলে তারা মুরতাদদের হুদুদও কায়েম করতে পারেন।

কিন্তু যেহেতু খিলাফাহ নেই, মুসলিমদের মধ্যে অনেক লোকজন মুনাফিক এবং মুলহিদদের প্ররোচনায় পড়ে, কাফিরদের সাথে হাত মিলিয়েছে, তখন এরকম চেইন তাকফিরের অরাজকতা তৈরী হয়েছে। অপরদিকে তাকফির করা কর্তৃপক্ষও নেই বা যারা আছে তারাও দুর্বল অবস্থায় আছে। এজন্য জনগণ জানে না যে কি কি করলে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, এবং তারাও এরকম ঈমান বিধ্বংসী কাজে নিয়োজিত হচ্ছে।

আইএসের মতে এই রকম দলগুলো তো কাফির বটে, তাদেরও যারা কাফির মনে করবে না তারাও কাফির আবার তাদেরও যারা কাফির মনে করবে না তারাও কাফির। এখানে কোন জায়গায় তারা থামে এর কোন নিশ্চয়তা নেই।

কারণ না থামলে, তাদের মধ্যেও এরকম লোক খুঁজলে পাওয়া যাবে, যারা এই চেইনের শেষ অংশ অথবা কোন অংশকে তাকফির না করার কারণে তারা নিজেরাও এই কাফির চেইনে ঢুকে গেলো। আবার এদের মুসলিম মনে করার কারণে, তাদের পুরো জামাতটাই কাফিরে চেইনে পড়ে কাফির হয়ে গেলো।

কিন্তু তাদের মধ্যে যারা একটু সামাজদার, তারা বলে যে, তারা চেইন তাকফির করে না। তাদের খলিফা এবং উলামারা মিলে যাদের কুফরের ব্যাপারেনিশ্চিত হয়েছে, এবং অজুহাত সব তারা দূর করেছে, তারপরই যাদের তারা তাকফির করার করেছে।

এর আগে নয়, আর যেহেতু তারা নিজেদের রাষ্ট্র তাও আবার মুসলিমদের একমাত্র বৈধ রাষ্ট্র খিলাফাহ মনে করে। তাদের তো অধিকার আছে যে নিজেরা নিজেরা বিচার করে, নিজেরাই সেটার রায় দিয়ে, নিজেরাই হুদুদ কায়েম করে ফেলার, রায়কে চ্যালেঞ্জ করার কোন সুযোগ নাই। কারণ তাদের খিলাফাহ হলো ক্লাউড খিলাফতের মত।

বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকলেও, প্রতিটা আইএস সদস্যের হৃদয়ে এর অস্তিত্ব আছে। তারা নিজেদের খিলাফাহ মনে করে, বাস্তবে তামকীন, হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত আসলেই হলো কিনা এটা তাদের দেখার বিষয় নয়।

এখন যদি আমরা বলি একটা সেক্যুলার দল এই কাজটা করলো। এখন সেক্যুলারদের নীতিগত ভাবে কাফির এ ব্যাপারে আল-কায়দার সন্দেহ নাই। যে আসলেই সেক্যুলার সে কাফির। এ ব্যাপারে আমিও একমত। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যেই এরকম অনেক জা'মাত আছে, যেমন দেওবন্দ, ইখওয়ান - তারা এখানে আরেকটা স্টেজ আনতে চায় যে, সেক্যুলার বলতে কি বুঝানো হচ্ছে, এটার অনেক অর্থ আছে এগুলো স্পষ্ট না, তাই সেক্যুলার মানেই কাফির না।

এ ব্যাপারে আল-কায়দা একমত, কিন্তু যে আসলে সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠাতাদের সংজ্ঞার সাথে একমত না, তারা তো সেক্যুলারাই না। আল-কায়দা তাদের সেক্যুলার বলে না।

অর্থাৎ ঘুরে ফিরে একই কথা। এখন আল-কায়দা যেভাবে সেক্যুলারদের সংজ্ঞায়ন করে তাদের কাফির মনে করে, অন্যরা যারা ওভাবে সংজ্ঞা না করে বিষয়টা স্থগিত রাখতে চায়, কিংবা অন্য পথে নিতে চায়। আল-কায়দা শুধু এইজন্যেই এই অন্যাদেরও তাকফির করে? মোটেও না।

আল-কায়দা বেশী থেকে বেশী হলে, এদের অনেককে মুর্জিয়া মনে করে, কারণ এদের অনেকে বিষয়টা এ কারণে স্পষ্ট না করে স্থগিত রাখতে চায়, যেন মুলহিদদের সাথে কোন সাংঘর্ষিক সম্পর্কে তৈরী না হয়।

আল-কায়দা কিছু এক্সটেন্টে এটার সাথেও একমত যে, কোন মুনাফিক বা মুলহিদদের সাথে সম্পর্কের সময় এটা বলা জরুরী না যে তুই মুনাফিক তুই মুলহিদ। বরং তার সাথে যদি দাওয়াতের সম্পর্ক হয় তখন দাওয়াত যদি ফলপ্রসুও হয়। তাহলে তো সে পূর্বে কোন স্টেজের মুনাফিক বা মুলহিদ ছিল, সেটা আলোচনা করা অবান্তর হয়ে যায়।

কিন্তু যে সব দল মূলত জিহাদের কোন রূপরেখা রাখে না, দাওয়াত দিয়ে অবস্থার চেইঞ্জ চায়, তারাই সান্নিধ্যটাই নেয় যে, মুনাফিক-মুলহিদরা দাওয়াতের মাধ্যমেই ভালো হয়ে গেলো তো আমাদের তাদের মুনাফিক-মুলহিদ বলার দরকার হচ্ছে না। কিন্তু সমস্যা হয় যদি তারা দাওয়াত গ্রহণ না করে, তখন কি হবে? তারা আর এই উত্তর দিতে পারে না।

আর তাদের দাওয়াত যদি ফলপ্রসূ হওয়া শুরুর করে, তখন তাদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। তাই তারা একটা সময় দাওয়াতকে এই পর্যায়ে বিস্তার করে না, যে পর্যায়ে গেলে মুনাফিক-মুলহিদদের তাদের নামে ডাকতে বাধ্য হতে হয় এবং একটা সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরী হয়।

তবে আল-কায়দা এধরণের আলেমদের দরকারী আলেম মনে করে, দালাল না। কিন্তু আইএস এসব আলেমদের মুনাফিক কিংবা কাফিরই মনে করে। কারণ তারা সেক্যুলারদের তাকফির করছে না। আবার অনেকে সেক্যুলারিজমের শিথিল করা ব্যাখ্যা হাজির করছে, কিংবা গণতন্ত্রের ইসলামী ভার্সন।

উপরে সেক্যুলারিজম নিয়ে যা বললাম তা গণতন্ত্রের জন্যও খাটে। মৌলিকভাবে সেক্যুলারিজম আর গণতন্ত্র একই, যদিও মানুষ এর ভিন্নতা করে। কাফিরদের সাথে তাল মিলাতে, আবার আল্লাহকেও খুশি রাখতে। এরকম যারা করে তারা যে সকলেই যে ভুল করে করে, কিংবা অজ্ঞতা, শক্তি না থাকার ফলে ভয়ে করে এমন না।

অনেকে আসলেই দুনিয়া কামানোর জন্য করে। অনেকে আসলেই তেমন, যখন তারা মুসলিমদের সাথে থাকে, বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই, আবার যখন কাফিরদের সাথে থাকে, বলে আমরা তো তোমাদের পাশেই, আমরা তো মু'মিনদের সাথে ছলনা করছি।

এরকম মুনফিকদের ব্যাপারেও কিন্তু আল-কায়দা সতর্কতার সাথে ব্যবহার করে। তাদের ক্ষতি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। আবার তাদের অনেক সমর্থক থাকতে পারে, তাদের আবেগ আছে তার ব্যাপারে,ভালো ধারণা আছে। আল-কায়দা এমন কাজ করতে চায় না, যেন এই সমর্থকরা আল-কায়দাকে ইসলামের শত্রু মনে করে।

কিন্তু আইএসের কাছে এসব হচ্ছে স্বার্থান্বেষী কাজ। এরা মুনাফিক, এদের সাথে ছলে বলে যারা কাজ করে তারাও মুনাফিক - তারাও দ্বীন ছেড়ে দুনিয়ার জন্য কাজ করছে। এমনকি আইএস না, এরকম অনেকেও এভাবে চিন্তা করে। অথচ নবীজী (সা.) মদীনার মুনাফিকদের সাথে এমন আচরণ করছিলেন, যখন সাহাবরা এমনকি মুনাফিকের সন্তান পর্যন্ত অনুমতি চাইছিলো যে, তার বাপের কল্লাটা এনে নবীজীর (সা.) চরণ তলে হাজির করতে।

কিন্তু নবীজী (সা.) বলেছিলেন, লোকে যেন না বলে আমি আমার সাথীদের হত্যা করি। নবীজী (সা.) নিশ্চয়ই দুনিয়াদার ছিলেন না। দ্বীনের জন্য মুনাফিকদের সাথে আপোষও করেননি। বরং এটাই মধ্যমপন্থা। তিনি আমাদের কূটনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি, সার্বজনীন প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, সেই আমলেই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন।

ইরান-শিয়া সুন্নীদের বড় শত্রু নাকি আইসিস?

ইরান শিয়া এরা সুন্নীদের বড় শত্রু নাকি আইএস (ISIS)? এর উত্তরটা হচ্ছে শিয়া কিংবা ইরানের অপরাধের কাছে আইএসের অপরাধ শিশু পর্যায়ের। কিন্তু সল্প মেয়াদের আইএসের আঘাত এত তীব্র এবং কষ্টকর যে, সেটা সহ্য করা অনেক কঠিন।

সেটার ক্ষয়ক্ষতিও অনেক গভীর। যেরকম ভাবমূর্তি তারা বানিয়েছে, আর যেরকম কাঠামো তারা নিজেদের জন্য তৈরী করে রেখেছে। যে কেউ ভিন্ন জাতীয়তাবাদী পতাকাতল থেকে আক্রমন করে, তাদের নামে চালিয়ে দিলেও, তারা তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে কিনা এত কিছুর তোয়াক্কা না করে সেটা তাদের দাবি করে ফেলবে।

এই জন্য যে তাদের অস্তিত্বটা যদি একটু জানান দেয়া যায়। তাই তাদের ক্ষতিটা শিয়াদের মত দীর্ঘ না হলেও, সল্প মেয়াদের তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতেই হয়।

আপনি কখনো দেখবেন না যে, তারা কোন হামলার দায় অস্বীকার করে। বরং সবগুলোই তারা দাবি করে। অথচ আল-কায়দা,তালিবানদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা অনেক সময়ই কোন হামলার অভিযোগ তাদের উপর গেলে তারা তা অস্বীকার করে।

এমনকি তাদের কোন সদস্য কিংবা শাখা ভুল-ভাল হামলা করলে তারা

সেটা অস্বীকার করে, এবং দিয়ত[20] দিতে রাজি থাকে। পূর্বে শাখাগুলোর ভুল আক্রমণকে প্রকশ্যে সমালোচনা করা না হলেও, পরে থেকে শাখাগুলো, কিংবা মিত্ররা ভুল করলে সেগুলোর গঠণমূলক সমালোচনা করা হয়।

আপনারা হয়ত জানেন না, কারণ আপনারা তাদের কথাগুলো এত সহজে পান না। আর মিডিয়াও আইএসের বিষয়গুলো ফলাও করে প্রচার করে, কারণ এত সহজে তাদের নামে জিহাদী দলগুলোকে কালারিং করা যায়। পূর্বে এরকম অনেক ভুল কিছু তালিবান,আল-কায়দার নামে ছড়ানো হয়েছে।

যা তারা করেনি, মিডিয়া যেভাবে দেখাচ্ছে সেভাবে না আসলে। কিন্তু মানুষজন মিডিয়ার কথাটাই পেয়েছে, তাই কমবেশী বিশ্বাস করেছে। তাদের কথাটা পায়নি, বিশ্বাস করেনি।

মিডিয়াগুলো আদর্শ আর দাড়ি-টুপি ওয়ালাদের আদর্শের ভিত্তিতে মিডিয়াকে সন্দেহ করে দাড়ি-টুপি ওয়ালাদের ব্যাপারে যে হুসনুয যন রাখবে, এই মন মানসিকতাও আমাদের নেই।

কারণ মাসলাক ভিন্ন হলে, তাদের চেয়ে সেক্যুলার কিংবা শিয়াদের আমরা বেশী প্রধান্য দেই, তাদের নিউজগুলো বিশ্বাস করি। বিশ্বাস না হলে নিজেদের হালত একটু চেক করে দেখতে পারেন। দীর্ঘ মেয়াদের শিয়ারা বড় শত্রু, ঐতিহাসিক শত্রু, দীর্ঘ মেয়াদের তাদের ক্ষতি অনেক। তাদের এমন এমন অপরাধ আছে, যা আসলে আইএসের নৃশংসতাকেও হার মানাবে। যেহেতু তাদের একটা হুকুমত আছে এজন্য তারা অনেকটা কূটনীতি করে চলে।

---

[20] দিয়াত বা রক্তপণ-
https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=19§ion=424

আর সুন্নীদের মাঝে শিয়ারা তো তাকিয়া অর্থাৎ সুন্নীদের মত আক্বীদা পোষণ করার দাবী করে ধীরে ধীরে শিয়াইসমের বিষ সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের মিলিশিয়াগুলো যেখানেই সুন্নীদের চাইতে শক্তিশালী হয়ে উঠে, সুন্নীদের প্রতি তাদের হিংস্রতা কতক ক্ষেত্রে ইহুদীদেরও হার মানায়। আর শিয়া কিংবা বর্তমান ইরানের সাথে ভারতের মুশরিকদের খুব ভাব। যেমনটা মদীনার ইহুদীরা মক্কার মুশরিকদের গিয়ে বলেছিলো যে, মুসলিমদের দ্বীনের চাইতে মুশরিকদের দ্বীন ভালো।

এতকিছুর পরও আইএসের ব্যাপারে যেমন তাৎক্ষণিক ঔষধ প্রয়োগের দরকার পরে, সেখানে শিয়াদের ক্ষেত্রে একটু কূটনীতি-রাজনীতির দরকার পরে। কারণ তাদের হুকুমত আছে, তাদের এজেন্টরা আছে সুন্নীদের মধ্যে। যেমন সুফীরা একপ্রকার তাদের এজেন্ট। গণতান্ত্রিকরা এক প্রকার তাদের এজেন্ট।

তো এই জন্য শিয়াদেরকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. জনগণ।

২. তাদের প্রশাসন।

৩. মিলিশিয়া।

জনগণের সাথে কখনোই যুদ্ধে জড়ানো যাবে না। হুকুমত থাকলে সাহবীদের গালাগালি করার কারণে তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রকাশ্যে কোন কুফরী বিষয় প্রমাণ করা গেলে হদও কায়ম করা যেতে পারে।

কিন্তু সেটাকে জনগণের উপর যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা গণহত্যার কোনো ভাইব দেয়া যাবে না। বরং প্রজন্মকে টার্গেট করে আক্বীদা চেইঞ্জের মেকানিসম তৈরী করতে হবে। সরকারগুলোর সাথে চুক্তি কিংবা যুদ্ধ বিরতি করে। আপাতত ক্রুসেডর-জায়ানিস্টদের দিকে মনোযোগটা স্থির রাখা যেতে পারে।

তবে তারা আগ্রাসন চালালে নিজেদের প্রতিরক্ষা নিশ্চয়ই করতে হবে। আর মিলিশিয়াদের ব্যাপারেও সেইম কথা।

কিন্তু মিলিশিয়াগুলো মূলত সরকারের চাইতে অসভ্য বেশী হয়। সরকারের তো একটা জবাব দিহিতা, ব্যবস্থাপনার দায় থাকে, মিলিশিয়াদের এই দায়বদ্ধতা থাকে না। তাই তারা নির্যাতনের চরম মাত্রাটাই ব্যবহার করে সুযোগ পেলে। এদের সাথে যুদ্ধ করলেও কখনোই সেটা জনগণের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। তারা চেষ্টা করবে করার। তাই যতটুকু হ্রাস করা যায়, তার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু তাদের ক্ষতির ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। তাদের প্রতারণাগুলো নিয়ে সর্বদা কথা বলতে হবে। তারা যেন সুন্নীদের, নিজেদের আক্বীদা-মানহাজে প্রভাবিত করতে না পারে, সুন্নীরা যেন তাদের তাকিয়া নিয়ে সতর্ক থাকে সে ব্যাপারে অলটাইম আপডেট থাকতে হবে। অর্থাৎ এই মুনাফিকদের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ চলবে পুরো দমে।

এর জন্য সঠিক ইতিহাস চর্চা, সাম্প্রতিক সব ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আপডেট থাকাও জরুরী। মিডিয়ার কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস না করার জন্য, কোন মিডিয়া কারা পরিচালনা করে সেগুলো জানতে হবে।

বিশেষ করে কেউর বিশ্বাস কর্মপদ্ধতি এবং লক্ষ্যের ব্যাপারে ভাল করে জানলে তাদের করা নিউজের সত্য-মিথ্যা, উদ্দেশ্যে সহজে বুঝা যায়।

যেমন তুর্কির প্রশাসনের লক্ষ কি? তারা মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে নিউজ করলে এর সত্য মিথ্যা কিংবা উদ্দেশ্য কি হতে পারে। মৌলবাদীরা অন্য মাসলাকের হলে আমরা কাদের পক্ষে থাকবো।

কিংবা সুফী নামধারী কেউ শিয়াদের ভালোবাসে কিন্তু সালাফীদের (কথিত সালাফি নয়) ঘৃণা করে, তার কথার উদ্দেশ্যে কি হতে পারে।

সে কার স্বার্থে কথা বলবে? তার কথার, খবরের ক্রমানুসার কোন দিকে থাকবে সেট বুঝা সহজ হবে।

কিংবা সালাফী কেউর পক্ষপাত কতটুকু থাকলে বুঝবো সে আইএস পক্ষপাতিক। কিংবা মাদখালী কিংবা আসলে এরকম কিছু নয়, স্বাভাবিক।